আমরা
ফেলুদা
e-পূজাবার্ষিকী ১৪২১
FFC™

e-পূজাবার্ষিকী ১৪২১

"~FELUDA FAN CLUB~"

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/

ফেলুদার লিমেরিক / আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলুদা করেন রহস্যের সমাধান--
গোলাগুলি নয়, মগজাস্ত্রই আসল প্রমাণ।
মগনলাল-বনবিহারী,
কারুকেই তিনি দেন না ছাড়ি--
ক্রিমিনালরা ফেলুচাঁদকে করেন তাই প্রণাম।

e-পূজাবার্ষিকী ১৪২১

সূ.চি.প.ত্র

কমিকস

বিশেষ নিবন্ধ

লিমেরিক

ফেলুদা স্পেশাল

খেলা

ছড়া-কবিতা

তুলির টানে

দীপান্বিতা ভট্টাচার্য, শিলাদিত্য বসু, রৌনক ব্রাউন, আখর বন্দ্যোপাধ্যায়,

তৌসীফ হক এবং অর্ক চক্রবর্তী

আলোর চিত্ররেখা

সৌমী মল্লিক, বিভাস মজুমদার, সৌম্যদীপ পাল, রাজর্ষি ঘোষ

এবং শুভঙ্কর ঘোষ

প্রচ্ছদ

সৌজন্যে Doodlers

সম্পাদক মণ্ডলী

উজ্জ্বল দত্ত, সোমা মজুমদার, সহেলী রায়, অঙ্গনা সেনগুপ্ত, চিরঞ্জীৎ দাস, দেবায়ন ঘোষ, রৌনক ব্রাউন, সৌমী মল্লিক, শুক্লা সিংহ, শুভদীপ ভট্টাচার্য, সায়নদীপ চট্টোপাধ্যায়, আখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রক্তিম আচার্য

প্রকাশক

"~FELUDA FAN CLUB~" কতৃক Facebook থেকে Digital PDF Format-এ

প্রকাশিত এবং সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই e-magazine–এ ব্যবহৃত বিভিন্ন স্কেচ, ড্রইং ইত্যাদি Google থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলির Owner & Original Uploader–দের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ

"~FELUDA FAN CLUB~"

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/

Email: feludafanclub.01@gmail.com

আমাদের কথা

ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, ভাই বোনেরা ও শ্রদ্ধেয়া গুরুজনেরা,

আপনাদের স্নেহ ভালোবাসা ও আশীর্বাদের দ্বারা অনুপ্রানীত হয়ে আমরা আবার আপনাদের সামনে ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের পুজো সংখ্যা পত্রিকা প্রস্তুত করছি। এর আগে দু বার আমরা আমাদের পত্রিকা প্রকাশিতা করেছি ও দুবারই তা আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সফল হয়েছে। আশা রাখি যে এবারের শারদ সংখ্যাও আপনাদের ভালো লাগবে। আর আপনাদের ভালো লাগলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বাংলা সাহিত্যে ফেলুদা হলেন একটি বর্ণময় চরিত্র। যদিও উনি একজন পেশাদার গোয়েন্দা ও মূলত ওনাকে নিয়ে লেখা গল্প, উপন্যাস গুলোকে গোয়েন্দা গল্পো বা উপন্যাসই বলা হয় চলিত কথায়। কিন্তু সত্যি কি ফেলুদা মাত্র গোয়েন্দাগিরির মধ্যেই আবদ্ধ ? ফেলুদার গল্প গুলো পড়তে পড়তে কিন্তু আমরা গোয়েন্দাগিরির বাইরেও ওনার নানারকম গুণের পরিচয় পাই। অনেক বিষয়ে ওনার জ্ঞান ও উৎসাহ আছে যা স্থানে স্থানে আমাদের চমৎকৃত করে। এক কথায় বলতে গেলে ফেলুদার গল্প গুলো পড়তে পড়তে নানা বিষয়ে আমাদের সাধারণ জ্ঞান বেড়ে যায়।

বুদ্ধির খেলার সাথে আছে অনাবিল আনন্দ, মজা ও নানা ঘটনার ঘনঘটা ফেলুদার গল্প, উপন্যাসে। বস্তুত যেমন ফেলুদা – তোপসে – লালমোহনবাবু, এই ত্রিরত্নকে একসাথে ছাড়া ভাবতে পারা যায়না ঠিক তেমনি ফেলুদার গল্প, উপন্যাস গুলোও শুধু মাত্র গোয়েন্দা গল্প, উপন্যাস নয়। তা হলো জীবনের নানা রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-র সমস্তই-ওই ত্রিরত্নর সমাহারের মতই। তাই বোধয় এই ত্রিরত্ন কিশরে-কিশোরী, তরুণ-তরুনী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়া-প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবার কাছেই সমান প্রিয়। তাই ফেলুদা কে আদর্শ মেনে আমরাও নানা ভাবে সাজিয়ে তুলেছি আমাদের এই শারদ পত্রিকাকে। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের পত্রিকায় খুঁজে পাবেন নানা বিভিন্ন রস ও রূপের অনুভূতি, সরসতা আর নাবিল আনন্দ ঠিক ওই ত্রিরত্নর জীবন দর্শনের মত।

অনুরোধ শুধু একটাই। যদি পত্রিকা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে যদি এক লাইন ও লিখে আমাদের জানান তাহলে আমরা অনুপ্রানীত হব, বাধিতও হবো, ধন্য হবো। আর যদি পত্রিকা আপনাদের ভালো না লাগে তাহলে ও আমাদের জানান। আমাদের ভুল ত্রুটি গুলো শুধরে দিন আমাদের মার্গ দর্শন করান। আমরা আন্তরিক ভাবে কৃত্যজ্ঞ থাকব। পুজোর দিনগুলি আপনাদের সবার ভালো কাটুক। জগৎ জননী মা দুর্গার আশীর্বাদ আপনাদের সবার উপর বর্ষিত হোক। এই প্রার্থনা জানিয়ে ও সবাইকে নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ শেষ করছি।

বিনয়াবণত,

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব নিবেদিত

শারদীয়া পত্রিকার সম্পাদক-সম্পাদিকাবৃন্দ

দুর্গা পূজোর দিনগুলি আনন্দমুখর হয়ে উঠুক

শারদ শুভেচ্ছা

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/

কবিতা

আসছে শরৎ

সঞ্জয় রায়

অরুণ আলোয় সাজিছে শরৎ, তোমার আসার ক্ষণে
কাশের চামর দুলিছে বাতাসে, আজি পুলকিত প্রাণে
ধবল মেঘের শামিয়ানা খানি, আকাশের বুকে কে দিলো কে জানি
কী শোভা তাহার! হেরি হিয়া ভরি, উচ্ছাসে ভরে মন -
ঘনাইছে মাগো তোমার আসার ক্ষণ।

সমীরণে আজ তোমারি জয়ধ্বনী, কান পেতে শুনি সুমধুর আগমণী
তিমির নাশীনি দশভুজা রূপে, আবার জননী আসিবে সন্মুখে
দেবে ও মানবে মিলাইলে তুমি, কৈলাস হতে নামি
তোমায় পূজিয়া ধন্য হলো, পুণ্য বঙ্গ ভূমি
শক্তি রুপিনি তুমি মা দুর্গা, পদ্মলোচনা শিবানী
তুমিই তো মাগো, পুণ্য রূপিনী মঙ্গলময়ী ভবাণী
গিরি নন্দিনী অন্নপূর্ণা, তুমিই প্রকৃতি তুমি অনন্যা
লাখো সন্তান তৃষিত হৃদয়ে, চেয়ে আছে পথপানে
পুণ্য আশীষে ধন্য করো মা, তব বরাভয় দানে ॥

বিশেষ নিবন্ধ

রাজকীয় শখ

শুভঙ্কর ঘোষ

চিঠির আদানপ্রদান আজকাল প্রায় অবলুপ্তির পথে এগোলেও ভুলেও ভেবোনা ঢেউ খেলানো পরিসীমার ডাকটিকিটের বিক্রি বাটা বন্ধ হয়ে গেছে। মহানগরগুলির জি.পি.ও. -এর ফিলাটেলিক ব্যুরোগুলিতে এখনও প্রচুর মানুষ ভিড় জমায় শুধু ডাকটিকিট কেনার জন্যে। এদের তুমি পাগল বলতেই পার, কিন্তু এরাই তো আসল রাজা। কারণ ডাকটিকিট সংগ্রহকে এক কথায় বলা হয় 'শখের রাজা, রাজার শখ'।

তবে তোমরা বলতেই পার আজকাল ছ'মাসে-ন'মাসে দু একটা যা চিঠি আসে তার উপরে ঠাঁসা ডাকটিকিটগুলো দেখে মোটেই সংগ্রহের ইচ্ছে জন্মায় না। কথাটা একপ্রকার ঠিকই। সব ডাকটিকিটেই যদি সেই রাজীব গান্ধী, বি.আর.আম্বেদকারের ছবি থাকে তবে আর তাকে জমাতে কারই বা ভালো লাগে, প্রতিটার এক কপি করে কিনে নিলেই তো ব্যস সংগ্রহ শেষ।

আদতে তোমরা সাধারণত যে স্ট্যাম্পগুলো দেখে থাক সেগুলো হল ডেফিনিটিভ স্ট্যাম্প। এগুলো ছাপা হয় একসঙ্গে অনেক, মুদ্রণ মান খুব একটা ভালও নয়৷ আমাদের নিত্য ব্যবহারের জন্য ছাপা হয়। এই স্ট্যাম্পগুলো সংগ্রহের বস্তু হলেও, প্রধানত আমরা সংগ্রহ করি কমেমোরেটিভ স্ট্যাম্প৷ এই স্মারক ডাকটিকিটগুলি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যও হয় বিভিন্ন৷ বিভিন্ন জাতীয় বিষয়, বিশেষ ব্যক্তির জন্ম ও তিরোধান বার্ষিকী উপলক্ষ্যে৷ এই স্ট্যাম্পগুলি

একবারই ছাপা হয়। তাই ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যায় না।একেবারে পাওয়া যায় না বললে ভুল হবে। তখন শরণাপন্ন হতে হয় স্ট্যাম্প ডিলারদের কাছে।বেশী দামে কিনতে হয় স্ট্যাম্পগুলো।

তাহলে এবার চলো এক ঝলকে দেখে নিই গত বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি কি স্ট্যাম্প প্রকাশিত হয়েছে -

১. ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের ১০০ তম অধিবেশন (৩ জানুয়ারী ২০১৩)

ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় ১৫-১৭ জানুয়ারী ১৯১৪ সালে,কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে। সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

গতবছরেও ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশন বসে কলকাতায় ৩-৭ জানুয়ারী।

এই স্ট্যাম্পের সঙ্গে প্রদত্ত নির্দেশিকা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। স্ট্যাম্পটির মূল্য ৫টাকা।

২. স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০ তম জন্ম (১২ জানুয়ারী ২০১৩)

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত হয় চারটি স্ট্যাম্প। স্ট্যাম্পগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ছাড়াও রয়েছে বেলুর মঠ, দক্ষিণেশ্বর, শিকাগো সম্মেলন ও কন্যাকুমারিকার ছবি। একটির মূল্য ২০ টাকা বাকি গুলির প্রতিটি ৫ টাকা।

৩.আরকিটেকচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া (১১.০৪.২০১৩)

এই সিরিজে স্থান পেয়েছে ভারতের দুটি বিখ্যাত মন্দির। অন্ধ্রপ্রদেশের আরাসাভল্লির সূর্য মন্দির ও শ্রীকুর্মামে বিষ্ণুর কুর্ম অবতারের মন্দির। এই স্ট্যাম্পগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করা হয় মিনিয়েচার শিটের মাধ্যমে। দাম ২০ টাকা ও ৫ টাকা।

৪. ফিলাটেলি ডে (১২.১০.২০১৩)

ফিলাটেলি ডে উপলক্ষে এবছরে যে স্ট্যাম্প প্রকাশ করা হয় তার বিষয় ছিল গান্ধী। মিনিয়েচারের মাধ্যমে স্ট্যাম্পটি বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়। এতে পূর্বে প্রকাশিত গান্ধীজীর কিছু ডাকটিকিট ও চরকা কাটা রত গান্ধীজীর ছবি চিত্রিত আছ। দাম ২০ টাকা।

৫. চিলড্রেন'স ডে (১৪.১১.২০১৩)

প্রতিবছরের মত এবছরেও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত ছবিটিকে ডাকটিকিটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।দাম ৫ টাকা।

৬. একলব্য (২৭.১২.২০১৩)

গুরু দ্রোণের কাছে তার গুরুদক্ষিণার কথা সবারই জানা। মহাভারত সিরিজের স্ট্যাম্পে ডাক বিভাগ তাকেই স্থান দিল। দাম ৫ টাকা।

৭. জাপানের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ভারত ভ্রমণ (৫.১২.২০১৩)

ভারত ও জাপানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নিদর্শন হিসাবে রঙিন মিনিয়েচার শিটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এই স্ট্যাম্প।একটি মাত্র ২০ টাকার স্ট্যাম্পে কুতুব মিনার ও জাপানের টকিও টাওয়ারের ছবি চিত্রিত আছে।

৮. সচিন তেন্ডুলকারের ২০০ তম টেস্ট খেলা (১৪.১১.২০১৩)

নজিরবিহীন ভাবে সচিন তেন্ডুলকারের জীবদ্দশাতেই প্রকাশ পেল এই স্ট্যাম্প । দুটি স্ট্যাম্প একটি সুন্দর মিনিয়েচারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। দাম ২০ টাকা প্রতিটি।

এই বছরই প্রকাশিত হয়েছে ভারতে সিনেমার ১০০ বছর উপলক্ষে একসঙ্গে ৫০টি স্ট্যাম্প, যা প্রকাশ করা হয় ৬টি মিনিয়েচারের মাধ্যমে। প্রতি স্ট্যাম্পের মূল্য ৫ টাকা। আর.ডি.বর্মন,ভূপেন হাজারিকা,উৎপল দত্ত-রাও স্থান পেছে এই সিরিজে।প্রথম দুটিতে দাদা সাহেব ফালকে পাওয়া সকল শিল্পী স্থান পেয়েছে।

এছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে ভারতীয় বুনো ফুলের ২০টি স্ট্যাম্প,মনোরমার ১২৫ তম বর্ষ, টাইমস অব ইন্ডিয়ার ১৭৫ তম বর্ষ,সত্য সাঁই বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। প্রতিটির দাম ৫ টাকা।

তাহলে গত বছরের ডাকটিকিটের হাল হকিকত তো জেনে নিলে। তোমরা শুরু করছ কবে থেকে ? সংগ্রহের আনন্দেই শুরু করে দাও সংগ্রহ,আর ভরে ফেল তাদের সুন্দর এক অ্যালবামে। তারপর তো তুমিও রাজা।

তাকলা বুড়োর ভূত ধরার যন্ত্র

সম্বিতা

"এই চত্বরে প্রথম দেখছি আপনাকে। "কথাটা এলো আমার ঠিক পেছন থেকে। আমি সমুদ্রের ঢেউদের কাছে আসতে দেখছি আর তাদের বালির চরে ভেঙ্গে পড়তে দেখছি। এখানের সমুদ্র পুরী কিংবা দীঘার মত এত চঞ্চল নয় খুব শান্ত প্রকৃতির। পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম এক জন বছর ষাটের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। গায়েকালো রঙের শার্ট প্যান্ট, মাথাতে কিছু কাঁচা পাকা চুল। আর চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের ঘোলাটে। এই চোখ দেখলে আমার কিছুটা অস্বস্তি হই। টিকলো নাক,চোখে মুখে অদ্ভুত ফিকে হাসি।

"আপনি?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"আমি ডক্টর তাকলা বারুই "

"হ্যা,আসলে বকখালিতে আমি নতুন এসেছি। এই ছুটি কাটাতে। এখানেই সমুদ্র থেকে কিছুটা দূরে একটা গেস্ট হাউস আছে। ওটাতেই আমি উঠেছি। গেস্ট হাউসটা আমার এক বন্ধুর।"

"আসলে ভোরে প্রতিদিনই বকখালি থেকে ফ্রেজার গঞ্জ মর্নিং ওয়াক করি। তবে আপনার পরিচয়টা?"

"ওহ হ্যাঁ,আমার খেয়াল ছিল না। আমার নাম প্রসেন পাল। কলকাতায় একটা কম্পানিতে অডিটিং-এর কাজ করি।"

"আচ্ছা আচ্ছা"

"আপনি কোথায় থাকেন?"

"এই ফ্রেজারগঞ্জে অমার নিজস্ব বাড়ি আছে। ওখানেই আমি আমার গবেষনার কাজ করি।"

"আপনি তাহলে কি নিয়ে গবেষণা করেন?"

"প্রেততত্ব "

"বিষয়টা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।"

"আপনি ভুতের বিষয়ে বোধ করি নাস্তিক। আপনাকে দেখেই তা বুঝতে পেরেছি।"

"যত সব বুজরুকি"

"যদি আমি প্রমাণ করতে পারি তাহলে?"

"আসলে যা দেখিনি সেটা বিশ্বাস করাটা সত্যি একটু কষ্টকর.......... এই শতাব্দীতে এসে আমরা এত এগিয়ে গেছি। দুনিয়া কোথা থেকে কোথায় চলে গেল আর আপনি!"

ভদ্রলোক খপ করে আমার হাতটা খপ করে ধরে বলল,"আসুন আমার সাথে"

"কোথায়?"

"আমার বাড়ি"

"কি হবে?"

"আপনাকে একটা জিনিস দেখানোর ছিল।"

"কি?"

"টুম্বক "

"টুম্বক আবার কি?"

"একটা যন্ত্রের নাম"

"যন্ত্র?"

"হ্যাঁ ভূত ধরার যন্ত্র"

"এও কি সম্ভব?" মনে মনে বললাম। তারপর বললাম হাতটা ছাড়ুন আমি অবশ্যই যাব।"

"ভদ্রলোক আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন আপনাদের একটা ব্যান্ড আছে না চক্রবুহ্য নামে?"

"হ্যা আপনি জানলেন কি ভাবে?"

"আপনাদের ব্যান্ডের ড্রামার রাজীব রায় মারা গেছেন না গাড়ি চাপা পড়ে?"

"হ্যাঁ " অবাক হয়ে বললাম।

"আপনার বন্ধু এখন আমার যন্ত্রের মধ্যে বন্দি আপনার কথা তো উনিই আমাকে বললেন।"

"কি বলছেন এসব?"

মনে মনে বললাম লোকটার কথা তো পুরোপুরি ফেলে দেওয়া যায় না। কারণ দু' মাস আগে সত্যিই রাজীব নন্দনের সামনে অসচেতন অবস্থায় গান গাইতে গাইতে রাস্তা পার হতে গিয়ে বাস চাপা পড়ে মারা গেছিল। এ ঘটনা ভদ্রলোক জানলো কি করে বেশ অবাক লাগলো। নির্ঘাত খবরের কাগজ পরে জানতে পেরেছে লোকটা। অস্বাভাবিক তো কিছু নয়। কিন্তু আমার বন্ধু সেটা জানাটা সত্যি অবিশ্বাস্য। মন বলছে এই অদ্ভুত যন্ত্রটা দেখতেই হবে এক বার। বললাম, "আপনার যন্ত্রে কটা ভূত এখন বন্দী?"

"যন্ত্রে একটার বেশি ভূত আটক করা যায় না। তাই একটাই ক্রিয়েটিভ ভূত এখন বন্দী।"

"আপনি কি ওর সাথে গল্প করতে চান?"

"আমি!"

"আপনার বন্ধুর সাথে আপনি কথা বলতে চান না?"

মনে মনে বললাম দেখা তো অবশ্য দরকার লোকটা ঠিক কি না ভুল বলছে? তাই বললাম ,"হ্যাঁ চাই। কিন্তু ক্রিয়েটিভ ভূত মানে?"

"আপনার বন্ধু রাজীব রায় ড্রামার। আর ড্রাম বাজাতে গেলে তো তালের ঠিক রাখতে হয়,তাই তিনি ক্রিয়েটিভ ভূত। হে হে হে........."

মনে মনে বললাম লোকটার মনে হচ্ছে মাথাটা গেছে। কার পাল্লায় যে পড়লাম। ভাবলাম নিরিবিলিতে একা একা থাকব,ছুটি কাটাব। কলকাতার যানজট, ভিড়ভাট্টা থেকে মুক্তি পাব। সে সব আর হল না। তবে খোঁজ খবর না নিয়ে অচেনা জায়গায় এসে অচেনা লোকটার বাড়ি যাওয়াটা ঠিক নয়। তার উপর যা পাগল লোকটা। গেস্ট হাউসের চৌকিদার রাজেনকে এক বার জিজ্ঞেস করাটা খুব দরকার। বললাম "আজ রাতে তাহলে যাব আপনার বাড়ি। কিন্তু এখন নয়। এখন আমার কিছু কাজ আছে।"

" অবশ্যই। আপনার বন্ধু তো দিনের বেলাতে ঘুমান। তাই আপনি রাতে গেলেই ভালো। উনি রাতে জেগে থাকেন। জানেন তো ভূতেরা রাতে জেগে দিনের বেলাতে ঝিমোয়। হে হে হে। " অদ্ভুত ভাবে হেসে আমাকে ভদ্রলোক কথা গুলো বলল।

আমি মনে মনে বললাম না মাথাটা পুরো গেছে দেখছি ভদ্রলোকের তবুও সমস্ত চেপে বললাম," গবেষণা ছাড়া আপনি আর কি করেন?"

"অগে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি তে ফিজিক্স পরতাম আর প্রেত্তত্ব নিয়ে গবেষণা করতাম। লোকে আমাকে পাগল বলে বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে বার করে দিল। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি কিন্তু পাগল নই। তাই শুধু প্রেততত্ব নিয়েই গবেষণা করে যাচ্ছি।"

"সে তো বুঝতেই পারছি। বলে মনে মনে হাসলাম।"

ভদ্রলোক বললেন,"সন্ধ্যে বেলাতে তাহলে দেখা হচ্ছে আপনার সাথে। মাছের ভেরি থেকে যে কোনো কাউকে যদি আমার নাম বলেন তা হলে আমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে সবাই। এবার তাহলে চলি মশাই। "এই বলে ভদ্রলোক জোর পায়ে হেটে দূরে চলে গেলেন। আমিও সমুদ্রের ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে গেস্ট হাউসের রাস্তা ধরলাম। রাজেন গেস্ট হাউসের গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললে "মর্নিং ওয়াক গেছিলেন বাবু?"

"আর আপনার বন্ধু তো আপনাকে ফোন করে পাচ্ছে না। শেষে গেস্ট হাউসে ফোন করেছিলেন আমার কাছে।"

"সৌম্য ?"

"হ্যা বাবু আপনার মোবাইলটা বন্ধ ?"

"কই না তো "এই বলে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোবাইলটা বার করে দেখলাম সেটা কখন জানি বন্ধ হয়ে গেছে। বললাম চার্জ শেষ হয়ে গেছে। "আচ্ছা তুমি কি তাকলা বারুইকে চেন?"

"তাকলা বুড়ো কি ভূত বিশেষজ্ঞ "

"হুম ,কিন্তু তাকলা বুড়ো?"

"ওনাকে সবাই তাকলা বুড়ো বলেই ডাকে।"

"খুব বড় প্রফেসর ছিলেন তিনি। কি জানি একটা মাথার ব্যামো হয়েছে ওনার। রাত দিন ভূতের সাথে থাকে তাদের সাথে বান্ধুত্ব করে। ওনার আবার মানুষ বন্ধু পছন্দ নয়। কেন বলুনতো বাবু? আপনি কি তাকে দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ সকাল বেলাতে সমুদ্রের ধরে হাঁটতে গেছিলাম। ভদ্রলোকও সকালে হাটতে এসেছিলেন। তাই পরিচয় হলো।"

"ওনার নাকি একটা ভূত ধরার যন্ত্র আছে। সচরাচর কারো সাথে মেলামেশা করেন না। একলাই মানুষ স্ত্রী মারা গেছেন বছর দশেক আগে। যতদুর জানি ছেলে পুলেও হয়নি। একাই থাকেন। চাকর বকরও নেই। একাই থাকেন।"

"হুম তুমি এক কাজ কর ঘরে চা জলখাবার পাঠিয়ে দাও। "এই বলে আমি ঘরে ফিরে এলাম।

রাজেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল। ঘরে এসে মোবাইলটা চার্জে লাগিয়ে স্নান সেরে চা জল খাবার খেয়ে নিলাম। তারপর চেয়ারে বসে রুবিক্স কিউবটা ওলট পালট করে মেলাতে লাগলাম। "

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। বলে রাখি,অফিসে কাজের পাশে পাশে আমি আমাদের ব্যান্ডে গিটার বাজাই আর কবিতা গুলো গান হয়ে যায়। কিন্তু আজ একটা কবিতাও মাথাতে এলো না। মাথায় ঘুরছে শুধু একটা কথা তাকলা বুরোর ভূত ধরার যন্ত্রর কথা হঠাত দেখলাম,আমি আমার গেস্ট রুমের ঘরে নেই যেখানে রয়েছি সেখানে বিশাল সমুদ্র। রাজীব সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। আমাকে বলছে,আমাকে বাঁচা প্রসেন আমাকে বাঁচা। তখুনি ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখলাম সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মনে পরে গেল তাকলা বুড়োর বাড়ি যেতে হবে এরপর তাকলা বুড়োর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। অবশেষে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা খুলে গেল। আর ভদ্রলোক ফিনফিনে একটা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে বেরিয়ে এলো। আমি অবাক হয়ে গেলাম। ক্যামেরা লাগানো আছে নাকি দরজাতে? মনে মনে বললাম। ভদ্রলোক এক গাল হেসে বললেন, "আপনার বন্ধুই বলল আপনি এসেছেন। ভালো দিন আজ। অমাবস্যা রাতে মৃত মানুষের আত্মারা সজাগ হয়। হে হে হে। "আবার সেই অদ্ভুত হাসি ভদ্রলোকের চোখে এবং ঠোটে। আশ্চর্য আমার মনের কথা উনি টের পেলেন কি ভাবে?" "আসুন" এই বলে ভদ্রলোক একটা ঘরে এনে বসালেন। ঘরটা খুবই সুন্দর ভাবে সাজানো। ঘরটার পশ্চিমে চারটে বুক সেলফে বই ভর্তি। কিন্তু সব ভূত সংক্রান্ত বই। ভদ্রলোকের ভূত বিশেষজ্ঞ তাই ভূতের বই পছন্দ হওয়া তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। দক্ষিন পূর্ব দিকের দেয়াল দুটিতে দুটো জানালা। পূর্ব দিকের জানালার পাশে রাখা রাইটিং ডেস্ক সেখানে সাজানো রয়েছে দশ বারোটা মত ভূতের বই পড়ে রয়েছে তাদের মধ্যে দেখলাম ড্রাকুলা,স্কন্ধকাটা,শাকচুন্নির বই। ভদ্রলোক তো দেখছি কিছুই বাদ রাখেননি। ঘরের মাঝ বরাবর। একটা ছোট কাঁচের টেবিল। তাকে কেন্দ্র করে দুটি চেয়ার। তারই একটাতে হাত দেখিয়ে ভদ্রলোক আমাকে বসতে বললেন। আমি চেয়ারে বসে পড়লাম। ভদ্রলোক বললেন" আমার বাড়িতে বিশেষ কেউ আসে না। একাই থাকি। সবাই আমাকে পাগল বলে। আমার সাথে সেই ভাবে মিশতে চায় না। আর আমিও তাই মিশি না কারো সাথে।"

"আমি বললাম আপনার যন্ত্রটি একবার যদি দেখান?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ,সেই জন্যই তো আপনাকে ডাকা। এই যন্ত্রটি কেউ দেখতে চায় না। একজন সহৃদয় লোক পেয়েছি দেখানোর। আমার আবিষ্কার তো কেউ এটাকে দেখতে চায় না বলে আমার খারাপ লাগে। যাকগে আপনি চা খাবেন?"

"হুম চলতে পারে"

ভদ্রলোক দু কাপ চা এবং এক প্লেট চিংড়ির চপ এনে টেবিলের উপর রাখলেন। বললেন"যন্ত্রটা নিয়ে আসি এবার?অমি বললাম "অবশ্যই।" ভদ্রলোক আবার ভিতরে চলে গেলেন। যেমনি কারেন্ট চলে গেল। ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। হঠাৎ এক মিনিট পর এক হাতে গয়নার বাক্সের মত একটা চকচকে জিনিস নিয়ে এলেন। মোমবাতিটা দূরের রাইটিং টেবিলটার উপর রাখা। ফুলদানিতে মোমবাতিটা রেখে,কাঁচের টেবিলের উপর বাক্সটা রেখে দিয়ে বললেন ," এই হলো যন্ত্রটা। "ভদ্রলোক এর পর আমার বিপরীত দিকের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। যন্ত্রটার উপর মোমবাতির এসে পরেছে। আর তাতেই দেখলাম, বাক্সটা টিন দিয়ে তৈরী। তার গায়ে পর পর পাঁচটা গোলগোল ফুটো রয়েছে। বাক্সটার উপর লাল রং করা। ভদ্রলোক বললেন, "তামার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে।

যাতে ভূতেরা তার পাশ দিয়ে গেলে আকর্ষিত হয়ে বাক্সের সামনে আসে। খানিকটা চুম্বকের মত। যন্ত্রটার নাম তাই টুম্বক।"

"আরিব্বাস দারুণ ব্যাপার তো?"বললাম আমি।

"অমাবস্যার মাঝ রাতে ছাদে উঠে ভূত ধরার যন্ত্র দিয়ে অনেক ভূত কে ধরেছি। আর তাদের জীবনের গল্প শুনেছি।"

"ভূতেদের জীবনী?"

"হ্যাঁ, ভূত বাক্সে আটকা পড়লে আমি তাদের জীবনের গল্প বলতে বলতাম। তারা নিরুপায় হয়ে তাদের গল্প বলত। পর দিন গল্প গুলো খাতাতে লিখে রাখি। এক বার বই মেলাতে দশটা ভুতের জীবনী নিয়ে বই বার করেছিলাম। অবশ্য প্রত্যেক বছরই আমার লেখা বই বের হয়। আমার ছদ্ম নাম কালো পেঁচা।"

"কি বলছেন আপনিই তাহলে কালো পেঁচা ! আপনার পাঁচটা উপন্যাস তো প্রাইজ পেয়েছিল। কিন্তু,শুনেছিলাম আপনি তা নেন নি। আপনার এত দিতে মুখ দেখতে পেলাম।"

"হ্যাঁ, বই গুলোর নাম হলো, শ্রমিক ভূতের জীবনী, এক শিক্ষক ভূতের জীবনী, এক,সাংবাদিক ভূতের জীবনী, কিন্তু লোকেরা আমার আবিষ্কার বুঝলো না। যাকেই এই যন্ত্রটার কথা বলতাম সবাই পালাত। আমাকে পাগল বলত।"

"আপনার গল্পগুলোর কয়েকটা আমি পরেছি। ভালো লেগেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার যে আপনার প্রাইজ পাওয়া বই গুলোর একটাও আমার পড়া হয়নি। মুখে শোনার বই পড়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তবুও যদি আপনি ছোট করে শোনান।"

"অবশ্যই, প্রথমে বলি শ্রমিকের জীবনী। ভদ্রলোক নয় ভদ্রভূত বলেই ওনাকে সম্বোধন করে বলি। ভদ্রভুতের নাম। উনি একটা পাটকলে কাজ করতেন। পাটকলটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উনি গরিব হয়ে পড়েন। পেটের দায়ে একদিন তিনি আত্মহত্যা করেন। এই হলো শ্রমিক সমস্যা। তবে মৃত্যুর পর তিনি আর আগের অসুবিধে গুলো পান না। ভালো আছেন। "আমি চায়ে একটা চুমুক দিয়ে চিংড়ির চপ্তায় কামর দিলাম। বললাম এর পর।?"

"এর পর ওনার ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নানা অভিজ্ঞাতার হয়। সেগুলো আমাকে বলেন। এর পর সাংবাদিকের জীবনী মিস্টার ঘনশ্যাম নন্দী। একটা খবরের কাগজের অফিসে কাজ করতেন। একদিন খবর সংগ্রহ করতে যাচ্ছিলেন মুম্বাইতে। ট্রেন এক্সিডেন্টে তিনি মারা যান। তারপর ওনার ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর বিভিন্ন ঘটনা আমাকে বলেন।"

"মর্মান্তিক মৃত্যু।"

এরপর এক ভূতের কথা বলি। তার নাম জীবিত কালে ছিল রামলাল। মৃত্যুর পরেও একই নাম ছিল তার। তাকে অন্য ভূতের সাঙ্গ পাঙ্গরা খুব বিরক্ত করত। ভুট্টার দেস ছিল। সে অন্য ভূতেদের মাছ চুরি করে খেত। ভূতটা আসলে ছিল মেছো ভূত।"

"মেছো ভূত?"

"কতো রকমের ভূত আছে ভূত রাজ্যে জানেন?গেছো ভূত,মেছো ভূত ,জলা ভূত। এদের আলাদা আলাদা সঙ্গ আছে। হে হে হে। "এই বলে লোকটা আবার হেসে উঠলো।

"একটু খোলসা করে বলুন"

"যারা গাছে থাকে তারা গেছো ভূত,মাছ খায় তারা মেছো ভূত,জলে থাকলে জলা ভূত,এরপরের গল্প আপনাকে শোনাই এক শিক্ষক ভূতের জীবনী।"

"অবশ্যই "

"কেলুচরণ মিত্তির ,সুন্দরবনের একটা গ্রামে থাকতেন। সেখানেই একটা স্কুলে পড়াতেন। একদিন যথারীতি অমাবস্যা রাতে যন্ত্রে আটকা পরে যায়। তারপর আমি ওনাকে জোর করতেই তিনি ওনার জীবনের গল্প আমাকে বললেন। ভদ্রলোকের আত্মীয় বলে কেউ ছিল না। ওনার বন্ধু সলিল দে নামে আরকজন স্কুল শিক্ষক ওনার সাথে থাকতেন। একদিন রাতে সলিল দের একটা হীরের অঙ্গটি চুরি হয়ে যায়। সেই চুরির দোষ পরে কেলুচরণের উপর। সলীল ইচ্ছা করে তার আংটিটা কেলুচরণের পকেটে রেখে দায়। পুলিশ কেলুচরণকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে আসলে কেলুচরণ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। সে তার বন্ধুকে চিনতে পারেনি বলে খুব কান্নাকাটি করে সেই থেকে অসৎ ব্যক্তিদের ঘাড় মটকে দেয়।"

"অদ্ভুত তো"

"হুম, সেই তো বলছি।"

"এই প্রক্রিয়া কি এখনও চালান। ভূত ধরেন আর গল্প শোনেন,তারপর সেগুলো লেখেন"

"আলবাত চালাই বই কি, যেমন আপনার বন্ধুটিকে ধরেছি, হে হে হে" লোকটা আবার বিচ্ছিরি রকমের হাসলো।

"আচ্ছা ভূত গুলোকে আবার নিষ্কৃতি দিতেন কি ভাবে?"

"এই যে দেখছেন পাঁচটা ফুটোতে পাঁচটা আঙুল ঢুকিয়ে বলবেন একটা ছড়া।?"

"ছড়া?" বেশ অবাক হয়ে গেলাম।

"হ্যাঁ, ভুতের যন্ত্র

ভুতের মন্ত্র,

তন্ত্র দিল ডিমে তা

ভূত অইলো স্বাধীনতা।"

"ছড়াটার যে দেখি কোনো মাথা মুন্ডু নেই।"

"ভূতেদের কি মাথা মুন্ডু আছে?হে হে হে,যন্ত্রটাতে কান দিন একবার। আপনার বন্ধু কি একটা জানি বলতে চায় আপনাকে।"

"মানে?"

"হ্যাঁ"

আমি যন্ত্রটার ফুটোগুলোতে কান লাগলাম একটা কণ্ঠস্বর সুনতে পেলাম। খুব চেনা কণ্ঠস্বর," প্রসেন আমি রাজীব। ,আমাকে বাঁচা। আমাকে তাকলা বুড়ো আটকে রেখেছে। আমি মুক্তি চাই।"

কথাগুলো শুনতেই শরীরে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল। ভাবলাম। সত্যি তো কথা গুলো মিথ্যে নয়। আমার বন্ধুকে বাঁচাতেই হবে। এই বেয়াড়া পাগল লোকটার কাছ থেকে। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। আমি মুহুর্তে বাক্সটা নিয়েই ওই বাড়িটা থেকে বেড়িয়ে সমুদ্রের দিকে দৌঁড় লাগালাম। ভদ্রলোকও আমার পিছন পিছন আসছে। আর চিৎকার করছেন। "কি মশায়? আমার যন্ত্রটা নিয়ে পালাচ্ছেন কোথায়? আপনাকে তো ভালো মানুষ ভেবেছিলাম।"

আমি দেখলাম ভদ্রলোক এখনো অনেকটা দূরে। বাক্সের ফুটোতে পাঁচটা আঙুল ঢুকিয়ে ছড়াটা গর গর করে বলে ফেললাম। আর তখনি বাক্সটা খুলে গেল। একটা হাওয়া আমাকে ছিটকে দিল। একদিকে বাক্সটা আরেকটা দিকে ছিটকে গেল বাতাসে একটা হওয়ায় একটা শব্দ ভেসে এলো।" অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধু,অসংখ্য ধন্যবাদ।" এরপর আর মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম, আমি গেস্ট হাউসে আমার ঘরটার বিছানাতে শুয়ে মাথার কাছে সৌম্য দাড়িয়ে বলল," কি হয়েছে রে তোর?কাল সারারাত তুই গেস্ট হাউসে ছিলিস না! তোকে রাজেন খোঁজ করেছে তুই কোথায় ছিলিস?"

"আমি মানে........." কথাটা শেষ হলো না। সৌম্য বলল," তোকে সমুদের ধরে বালির উপর অজ্ঞান হয়ে পরে থাকতে দেখে রাজেন আর কিছু আসেপাশের লোক তোকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসে। তারপর আমাকে ফোন করে। তারপর আমি শুনে সোজা কলকাতা থেকে চলে এলাম।"

"আমি তো তাকলা বুড়োর বাড়ি গেছিলাম।"

রাজেন বলল "আর বলবেন না বাবু শুনলাম তার মাথার ব্যামোটা বেড়েছে। তাকলা বুড়োকে আজ সকালে মেন্টাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সমুদ্রের ধরে বালির চড়ে পাগলের মত ওনার ভূত ধরার যন্ত্রটা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। কারো কথা শুনছিলেন না। মাথা খারাপ লোক। আর কি?"

আমি আর কোনও কথা বললাম না। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বিকেলের ট্রেনে সৌম্যর সাথে কলকাতায় ফিরে এলাম। সৌম্য বললো। আমাদের ব্যান্ডের নতুন ড্রামার হিসেবে কাজ করতে চায়। আমি বললাম, "অবশ্যই"

শেষ অবধি ভূত ধরার যন্ত্রটার যে কি হলো তা আর জানতে পারিনি। সেটাকে তো তাকলা বুড়ো সমুদ্রের ধারে পায়নি। তাহলে ওটা গেল কোথায় ?

আর্নো ডরিয়ান- শিলদিত্য বসু
শচিন তেন্ডুলকার - দীপান্বীতা ভট্টাচার্য্য
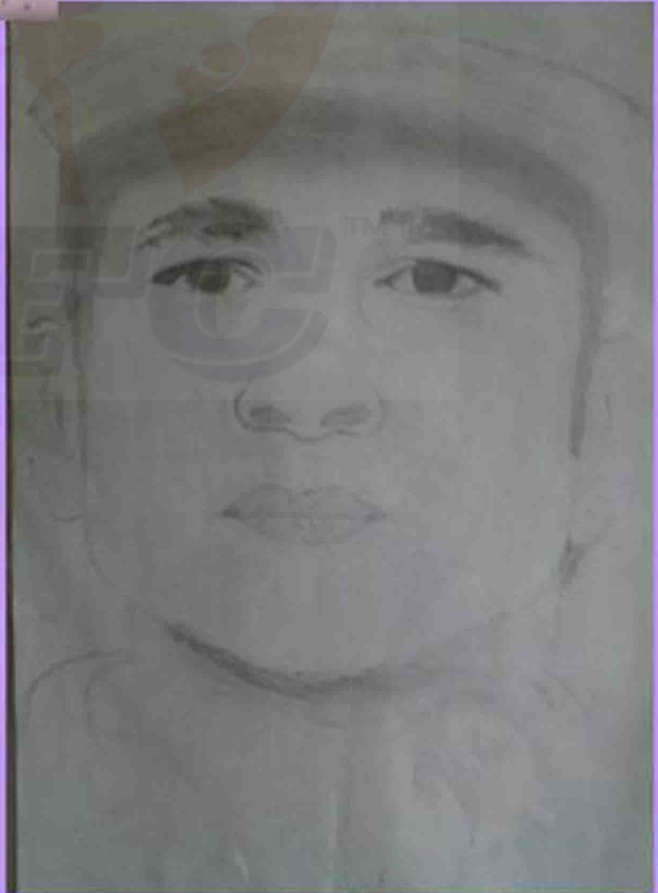
উপন্যাস
গোলকধাঁধা
দেবায়ন ঘোষ
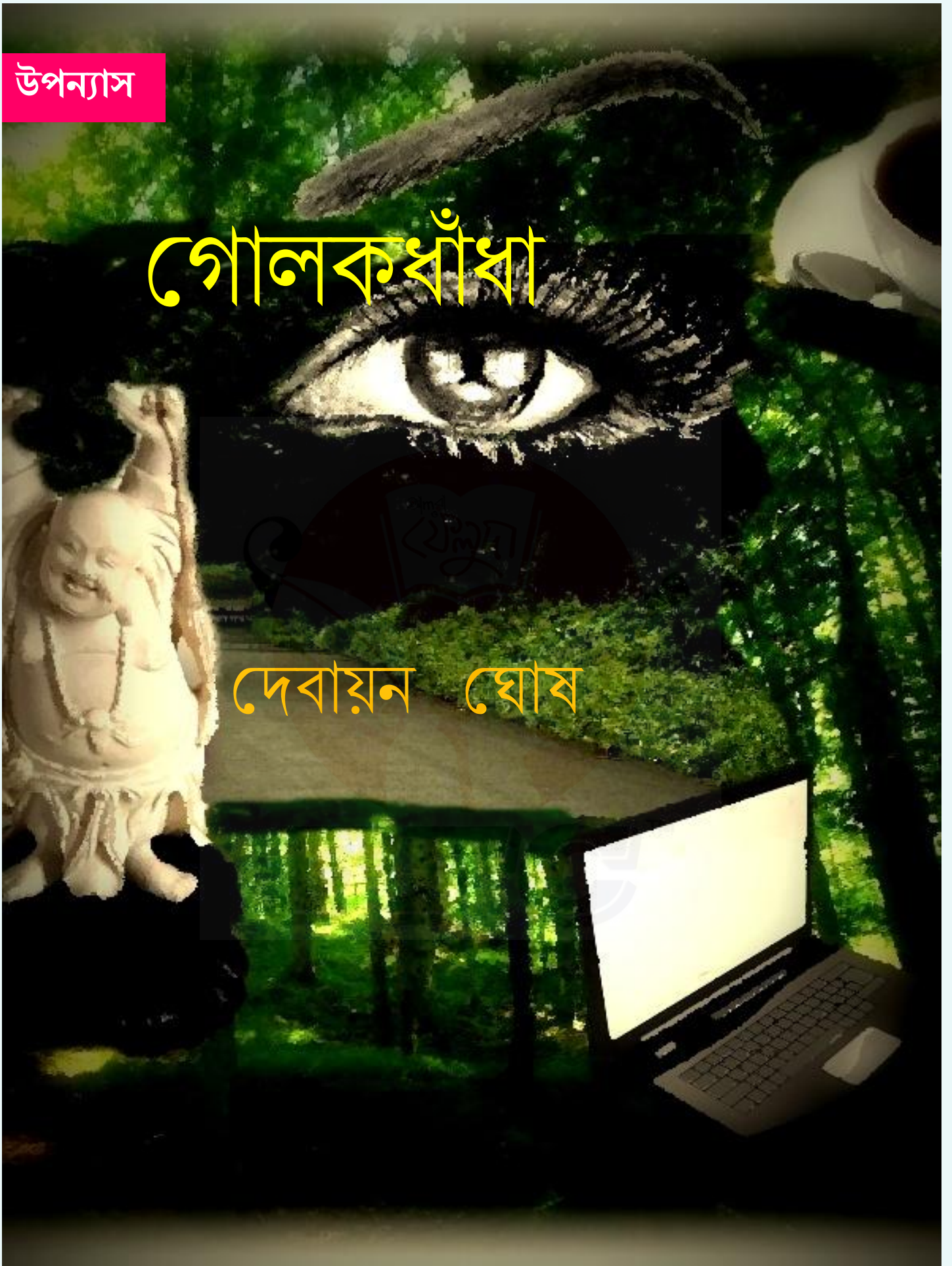
-১-

নতুন জায়গায় অনেকের তাড়াতাড়ি ঘুম হয় না। আমার ব্যাপারটা একদম আলাদা। তবে মাথায় যখন চিন্তা ঘুরপাক খায় তখন অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু সাধারণ কারণে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না। তাই আজও সময়মত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কোন কারণে ঘুমটা ভেঙে গেল। হাতঘড়িটা পাশেই ছিল। চশমা ছাড়াই বুঝলাম প্রায় দুটো বাজে। শুয়ে থেকেই আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম কেন হঠাৎ জাগলাম। মিনিট দুয়েক পরেও যখন কোথাও কোন সাড়াশব্দ পেলাম না, পাশ ফিরলাম, আর তখনই আওয়াজটা কানে এলো। মনে মনে হাসলাম। এ তো বনবিড়ালের ডাক। যদিও এত রাতে একটু অস্বাভাবিক, তাও এসব জায়গায় বিচিত্র নয়। বালিশের পাশ থেকে মোবাইলটা তুলে স্ক্রিনটা দেখে আবার রাখতেই আরেকটা অন্য আওয়াজ কানে। খুবই তীক্ষ্ণ কিন্তু তাও বোঝা যায় ওটা বাইকের টায়ারের আওয়াজ। কেও এসেছে। এত রাতেও তাহলে এ বাড়িতে লোকজন যাতায়াত করে। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাওয়ার পর আবার চোখ বুঝলাম। কখন ঘুমিয়েছি ঠিক নেই। কিন্তু যে স্বপ্নটা দেখলাম তার সাথে এর কোন যোগসাজশ নেই!

-২-

সপ্তাখানেক আগের কথা। আইনক্সে আমরা চারজন সিনেমা দেখতে এসেছিলাম। হঠাৎই অভিষেকের এক বন্ধুর সাথে দেখা। আচমকা দেখা হওয়ায় তখন আর বেশি কথা হয়নি। দুদিন পর আমায় অভিষেক ফোন করে বলে যে জরুরি কথা আছে।

ওর বাড়িতে সেই বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হল। নাম রঞ্জন রায়। চেহারা দেখে কৌতূহলী ও বিবেচক বলে বোঝা যায়। বোলপুর থেকে অনেকটা দূরে লোহাগড় বলে একটা জায়গা রয়েছে। সেখানে এক পরিবারের কর্তার সেক্রেটারি হিসেবে সে কাজ করে। সম্প্রতি সেই পরিবারে এক উপদ্রব শুরু হয়েছে। কর্তা প্রতাপ চন্দ্র সরকারের ওই এলাকায় খুব নামযশ। আগে ইলামবাজারে থাকতেন। বছর কুড়ি হল এ বাড়িতে এসেছেন। কদিন আগে উনি কিছু হুমকি চিঠি পান। তার পর একটা বহুমুল্যবান জিনিসও খোয়া গেছে।

এই অবধি বলে রঞ্জনবাবু থেমে গেছিলেন। তখনই অভিষেক আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই নিবি কেসটা?"

এখানে বলে রাখা ভাল আমি উকিল কিংবা গোয়েন্দা, কোনওটাই নই। তাই এই হঠাৎ এই প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেলাম।

"আমি কি করব?"

"বাইরের লোক কাওকে চাচ্ছেন উনি। অভি আপনার কথা বলায় আমি ভাবলাম আপনাকেই জিজ্ঞেস করা ভাল। এই বয়েসেই আপনি তো বেশ কিছু তদন্ত করেছেন।", রঞ্জন রায় বেশ কেটে কেটে বললেন। অবিশ্বাস। খানিকটা ব্যঙ্গও রয়েছে। কটমট করে তাকাতে গিয়েও সামলে নিলাম। তারপর না ভেবেই বলে দিলাম, "ঠিক আছে। কাল আপনি ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দেখা করবেন।"

গুরুগম্ভীর গলায় কথাগুলো বলাতে রঞ্জনবাবু মাথা নেড়ে উঠে পড়লেন। আমার ফোন নম্বর নিয়ে দু একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে চলে গেলেন।

এবার না পেরে বলে উঠলাম, "কি ব্যাপার? হঠাৎ আমায় পি সি মিটার বানাবার ইচ্ছে কেন?"

"তুই তো একটু আধটু গোয়েন্দাগিরি করিস। তা নে না কেসটা। পারলে মোটা চেক আসবে! তা ছাড়া রঞ্জন আমার পরিচিত। যে গোয়েন্দা, সে যদি ওর চেনা হয় তাহলে ওর বসও একটু নিশ্চিন্ত হবে। ওইসব দিকের লোক। তার ওপর বয়স্ক। বুঝলি তো।"

"ব্যাপারটা জানিস? পুরোটা বল তো?"

"সাবাস। এর মধ্যেয়ই ইন্টারেস্টেড? কিন্তু আমি আর বেশি কিছু জানি না। রঞ্জনই তোকে বলবে।"

"তোর সঙ্গে কতদিনের চেনা?"

"কলেজের সিনিয়র ছিল। এছাড়া ফেসবুকে মাঝে সাঝে কথা হয়।"

তাড়া ছিল দেখে উঠে পড়লাম। রাস্তায় নামতেই একটা জরুরী ফোন এলো আর আমিও ব্যাপারটা ভুলে গেছিলাম। পরদিন যখন মিঃ রায় ফোন করলেন তখন আমি ঘুমোচ্ছি। ঘন্টাখানেক পর যখন ফোন করলাম তখন ওনার ফোন বন্ধ।

সন্ধ্যাবেলা আবার ফোন করলেন। আমার তেমন কিছু কাজ ছিল না তাই বললাম এসে পরতে। আধঘন্টার মধ্যেই উপস্থিত।

"সরি! একটু ব্যস্ত ছিলাম।"

"অসুবিধা নেই। কেমন লাগল মুভিটা?"

চোখ ছোট। হাত শক্ত। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কে বলল আমি সিনেমা দেখতে..."

"ঘাবড়াবেন না। আপনার ব্যাগের সঙ্গে লাগানো খাপে বোতলটার গলায় যে ট্যাগটা রয়েছে সেটা সহজেই চোখে পড়ে। বসুন। কফি তো খেয়েছেন। আরেক কাপ হবে?"

উনি এবার হেসে বললেন, "আপনি যাই বলুন আমার মনে হয় আপনিও আজ ... "

"না না। আগের দিনই আইনক্সে দেখলাম আপনি দশ মিনিটের মধ্যেই চার কাপ কফি খেলেন। তাই আজ না খাওয়ার তো কারণ দেখছি না।"

চোখ দুটো আবার এক পলকের জন্য ছোট হয়েই আবার কৌতুকে ভরা, "যাক অভি তাহলে আমায় ভুল লোক গছায়নি। হ্যাঁ, কফি হতে পারে।

কফিতে প্রথম চুমুক দিয়ে আমি বললাম, "তাহলে এবার বলুন। কি ব্যাপার।"

"প্রথমেই বলি আমাকে আপনি বলার দরকার নেই আমি অভিষেকের তিন বছর সিনিয়র। সেই সুবাদে আপনারও। গত বছর মাস্টার্স করে একটা চাকরিতে ঢুকেছি। অভিজ্ঞতা নেই। তা আমি যার সেক্রেটারি, উনিও নতুন কাউকে চাচ্ছিলেন।

"ভদ্রলোকের নাম আপনাকে আগে বলেছি। প্রতাপ চন্দ্র সরকার। আগে ইলামবাজারে থাকতেন। কুড়ি বছর আগে বোলপুর থেকে খানিকটা দুরে লোহাগড় বলে একটা ছোট শহর আছে। তার থেকে কিছুটা দূরে সোনাঝুরি নামের একটা জঙ্গলের পাশে খালি জায়গায় একটা বাড়ি বানিয়েছিলেন। পাকাপাকি ভাবে সেখানেই থেকে গেলেন।

"দু সপ্তাহ আগে, ওনার নামে একটা চিঠি আসে কুরিয়ারে। তাতে লেখা ছিল, 'তোমার যা প্রাপ্য নয় তা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে '।

উনি ঘাবড়ে গেলেও ততটা পাত্তা দেননি। দু দিন পর আবার ওই একই চিঠি আবার আসে।"

এখানে আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, "প্রথম চিঠিটা আসার পর উনি আপনাকে বলেছিলেন?"

"না। পরেরদিন আবার আরেকটা চিঠি আসে। তখনও আমি জানি না। ওইদিনই সন্ধ্যায় ওনার ই-মেল অ্যাড্রেসে একটা স্প্যাম মেল পাই। আমিই ওনার মেল চেক করি। একটা আনট্রাস্টেড সার্ভার থেকে পাঠানো। একই বয়ান।"

এই পর্যন্ত বলে উনি থামলেন। কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে আবার কিছু বলতে যাওয়ার আগেই ওঁর মোবাইল বেজে উঠল। দু মিনিট কথা বলে নিয়ে ফোনটা পকেটে রেখে বললেন, "কোথায় ছিলাম...?"

"একটা ই-মেল এলো ..."

"হ্যাঁ। কি ভেবে এটা ওনাকে দেখানোর পর উনি চিঠিগুলো দেখলেন। তিনটেই। আমি জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেননি এই ব্যাপারে। তার পরেরদিন উনি আমায় ডেকে পাঠান। সন্ধ্যাবেলায়।

"ওনার স্টাডিতে ঢুকতেই দেখলাম যে চতুর্দিকে জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে রয়েছে। একপাশে একটা বড় ক্যাবিনেট ছিল। সেটার ওপর ভয়ানক রকমের অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু চোরেরা সেটা খুলতে পারেনি। এছাড়া ওনার রাইটিং ডেস্কের ওপর থেকে

সমস্ত কাগজপত্র মেঝেতে ছড়ানো। মানে একেবারে সাঙ্ঘাতিক...।"

ব্যাগ থেকে বোতল বের করে, জল খেয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, " পরেরদিন সকালে যখন ও বাড়ির কাজের লোকটা ঘরটা গুছচ্ছে, তখন আমিও ছিলাম ওখানে। সেই সময়, মিঃ সরকার দেখতে পান যে সিন্দুকের বাঁ পাশে একটা বড় চিড় ধরেছে। একটু হাতাহাতি করতেই সেটা একপাশ দিয়ে খুলে গেল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে ওখান দিয়ে কেউ সহজেই কিছু বের করে নিতে পারবে।"

"কিছু মিসিং ছিল কি?"

"সেটাই বলছি। ওই সিন্দুকে টাকাপয়সা ছাড়া কিছু দলিল ছিল। কিন্তু তাছাড়া ছিল একটা আইভরির মূর্তি। প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা। সেটা নেই। বাক্সটা পড়ে রয়েছে।"

-৩-

ওয়াটস্অ্যাপে একটা মেসেজ এসেছিল। সেটা দেখে, উত্তর না দিয়েই আবার রঞ্জনবাবুর দিকে তাকালাম। উনি এবার ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে আমায় দিলেন। ভেতরে একটা ছবি রয়েছে। বুঝলাম সেটাই সেই মুর্তি।

খুবই পরিচিত। লাফিং বুদ্ধ। দু হাত ওপরে তোলা। এছাড়া বিশেষত্ব বলতে মনে হল যে চোখের মনি দুটো খুব উজ্জ্বল। ছবিটা ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা। তাই বোঝা যাচ্ছিল যে একটা কাচের শিট চাপা দেওয়া টেবিলের ওপর রেখে তোলা হয়েছে।

মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলাম, "একটা স্ন্যাপ নিতে পারি এটার?"

"ছবিটা তোমাকে দেওয়ার জন্যই। প্রিন্টটা তুমিই রাখো।"

"না। আমি স্ন্যাপ নিয়ে নিচ্ছি। প্রিন্টটা থাক।"

কাজটা করতে মিনিট দুয়েক লাগল। নানা ভাবে ওই ছবিটা থেকে আমার ক্যামেরায় প্রায় দশটা ছবি তুললাম। তারপর সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "উনি কি আমায় এই কাজেই শুধু নিযুক্ত করতে চান?"

"তার মানে?"

"দেখুন রঞ্জনদা। একটা মুর্তি চুরির জন্য কেউ এত দূর থেকে গোয়েন্দা ডেকে পাঠায় না।"

"কি বলতে চাও?"

"সেটা পরে বললেও হবে। আর কয়েকটা ইনফরমেশন দিন।"

"বল।"

"ওই বাড়ীতে আর কে থাকে?"

"এমনিতে মিঃ সরকারের তিন ছেলে। বড়জন মারা গেছেন বছর তিনেক আগে। মেজ ভাই

থাকে দিল্লীতে। ছোটজন বাবার সঙ্গেই থাকে। এছাড়া আমি। বাকি চাকরবাকর।"

এই সময় আবার রঞ্জনবাবুর মোবাইল বেজে উঠল। ইতস্তত করে উনি ফোনটা ধরলেন। মিনিট পাঁচেক কথা বলার পর ফোনটা নামিয়ে আমার দিকে ফিরেয় বললেন, "স্যার, ফোন করেছিলেন। তুমি তাহলে কেসটা নিচ্ছ?"

ফোনের একদিকের কথা শুনে অবশ্য আমিও সেটা ধরতে পেরেছিলাম। চিন্তা না করেই বললাম, "ঠিক আছে। তবে আমি কালকেই লোহাগড় রওনা হচ্ছি না।"

রঞ্জনদা সেটা শুনে মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক আছে। আমায় ফোন করে দিও।"

এই পর্যন্ত বলে তিনি উঠে চলে গেলেন। দরজার সামনে যখন, তখন পেছন ফিরে বললেন, "এই কেস সেরকম সোজা হবে না। দেখে নিও।"

কথাটা ব্যঙ্গাত্মক কিনা, সেটা নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না।

-৪-

সকালবেলা বেশ তাড়াতাড়ি উঠেছিলাম। একজন লোক চা দিয়ে গেল সাতটার সময়। খেয়ে নিয়ে বেড়িয়ে পরলাম। এত বড় বাড়ী প্রতাপবাবু শখ করে বানিয়েছিলেন এই ভেবে যে এখানে কালক্রমে বসতি গড়ে উঠবে। এত বছরেও তা হল না।

দোতলা থেকে নেমে নিচের হলটায় উঁকি দিয়ে বুঝলাম, বাকি সবাই ঘুমচ্ছে। অগত্যা বাইরে গিয়ে বাগানে ঢুকলাম। ছোট হলেও ছিমছাম। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পেছন দিকটায় আসতে দেখালাম এদিকেও অনেকটা জায়গা রয়েছে। কিন্তু তাঁর বেশিরভাগটাই আগাছা। কিছুটা ঘোরাঘুরি করে এক জায়গায় একটা বেঞ্চ দেখে বসলাম।

কেসটা জটিল। সেদিন রঞ্জনদার কথায় এতটা বোঝা যায়নি। গতকাল বোলপুরে নেমে রঞ্জনদাকে ধরতে পারছিলাম না। বলছে ' নট রিচেব্‌ল '। বোলপুরে আগে এসেছি। তাই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম নিজেই গাড়ি ভাড়া নিয়ে যাব নাকি। এই সময় একজন লোক এসে বলল, "সাব্‌ জী, কাঁহা যায়েঙ্গে? আসানসোল? বার্ধমান্‌? সিউরি?" লোহাগড় শুনে দমে গেল। তখনই আমার ফোনটা বেজে উঠল। স্ক্রিনে 'রঞ্জনদা' দেখে একটু বিরক্ত হয়েই ফোনটা ধরলাম।

"কি ব্যাপার? আমি তো এসে গেছি।"

"ঠিক আছে তুমি স্টেশানের সামনেই থাক। আমরা আসছি।"

'আমরা আসছি' শুনে ভেবেছিলাম বোধহয় আরও লোক আসছে। কিন্তু যখন দেখলাম শুধু ড্রাইভার রয়েছে, তখন বুঝলাম যে গাড়ি

চালককে সে হাতেই রেখেছে এবং দুজনের মধ্যে ভালই ভাব।

জায়গাটা লোহাগড় ছাড়িয়ে সোনাঝুরি জঙ্গলের ঠিক সামনে। পেল্লায় গেট। দোতলা বাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে, আশেপাশে তাকিয়ে বুঝলাম এ জায়গা লোকালয় থেকে খুব বাইরে নয় যেহেতু দোকানপাট ছাড়িয়ে দু মিনিট লাগল, কিন্তু বেশ একটা ছিমছাম পরিবেশ রয়েছে।

রঞ্জনদা বললেন যে সোজা আমরা মিঃ সরকারের সঙ্গে দেখা করব। তাই একতলায় ঢুকে বিশাল হলঘরটা পেরিয়ে আমরা ওনার স্টাডিতে বসলাম।

"নমস্কার। নমস্কার। আপনি আসায় খুব খুশি। রঞ্জন বলছিল ও ঠিক লোক ধরে আনবে", বলতে বলতে যিনি ঢুকলেন তিনিই যে এ বাড়ির কর্তা সেটা বলে দিতে হয়না। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, ফরসা, চোখে মোটা, গোল গোল চশমা, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি।

আমায় দেখে একটু থমকালেও, চওড়া হাসি হেসে বললেন, "তোমায় তুমি বললেই মানাবে, এত কম বয়স আমি আশা করিনি।"

রঞ্জনদা তাড়াতাড়ি বললেন, "ওনার বুদ্ধির পরিচয় আমি পেয়েছি। আমার চেনা রেফারেন্স তাই ..."

মিঃ সরকার মাথা নাড়লেন। তারপর আরেকবার মাথা ওপর নিচ করতেই, রঞ্জনদা বেরিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে উনি বললেন, "আমায় তুমি প্রতাপবাবু বলেই ডাকতে পার। যে কাজের জন্য তোমায় ডেকেছি তা আশা করি শুনেছ?"

আমি মাথা নাড়তে উনি আবার বললেন, "দেখ চোর ধরা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। এখানে আমার খ্যাতি প্রচুর। বললেই চোর ধরা পরবে। কিন্তু আমি চাই না যে ব্যাপারটা বাইরে যাক। একটা বিশেষ কারণেই সেটা বলছি।

সেটার জন্যই বাইরে থেকে তোমায় আনা হয়েছে।"

"অবশ্যই। ব্যাপারটা বলুন।"

আমার কথা শুনে উনি চোখ বুঝলেন। তারপর বললেন, "আমার পরিবার সম্বন্ধে রঞ্জন কিছু বলেছে?"

"তেমন কিছুই না। আপনার ছোট ছেলে এ বাড়িতেই থাকে আর মেজজন দিল্লীতে।"

চোখ বন্ধ অবস্থাতেই উনি বলতে শুরু করলেন, "বছর কুড়ি আগে যখন এ বাড়ি বানানো শেষ হয়, তখন আমার বড় ছেলে গৌতম আমার সাথে এখানে থাকত। ওর এক ছেলে গৌরব, তখন ছোট। বড় বউমা কিছুদিন ছিল এ বাড়ীতে। তারপর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেল আসানসোল। সেখানেই পাকাপাকি ভাবে থাকতে লাগল। আমি কিছুই বলিনি। গৌতম ইঞ্জিনিয়ার ছিল। ওখানেই চাকরি করে ছিল বছর কয়েক আগে অবধি। গৌরবকেও

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছিল। সে বেচারি যে বছর পাশ করল, সে বারই একটা বিশ্রী অ্যাক্সিডেন্টে সে তার পা দুটো হারায়।"

মক্কেল কথা বলার সময় আমি মোবাইলয়ে সেটা রেকর্ড করে নিই। এখানেও তাই করছিলাম। প্রতাপবাবু থেমে একটু জল খেলেন। আমি চুপ করেই রইলাম।

একবার বন্ধ জানলা দিয়ে বাইরে দেখে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, "আসানসোল থেকে ওরা যাচ্ছিল দুর্গাপুরের দিকে। গৌরবই গাড়ি চালাচ্ছিল। তেল যে প্রায় শেষ তা খেয়াল করেনি। কিছুটা যাওয়ার পর গাড়ি হঠাত করে থেমে গিয়ে বিশ্রী শব্দ করতে করতে করতে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। পেছনে একটা লরি আসছিল। সেটা কোনমতে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলেও গাড়িটাকে ঠুকে দেয়। ব্যাস সব শেষ ...।"

লক্ষ করলাম ভদ্রলোক কথাটা বলে আবার জানলার দিকে তাকালেন। শক্ত মানুষ। আবার বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। ঘরে একজন চাকর এসে আমার জন্য কফি দিয়ে গেল। সঙ্গে মিষ্টি।

"খেয়ে নাও। এখন তো সবে সাড়ে দশটা বাজে। দুপুরের খাওয়ার অনেক দেরি আছে।"

"আপনি?"

"না। আমার খাওয়ার নিয়ম আছে। সুগার ধরা পরেছে।"

"তারপর বলুন"

"হ্যাঁ। ওই ঘটনায় আমি খুবই ভেঙ্গে পরেছিলাম। তারপর যখন দেখলাম ছেলে-বউ আর নেই তখন নাতিকেই এ বাড়িতে তুলে আনি। আমার কাছেই সে থাকে। বেচারা চলা ফেরা করতে পারে না। উইলচেয়ার ছাড়া নড়তে পারে না। ও সবসময়ই নিরীহ ছিল। কিন্তু কেন যে শখ করে সেদিন..." গলা ভারী হয়ে আসছিল দেখে ইচ্ছে করেই কফিতে চুমুক দিলাম। তারপর বললাম, "ও এখন এ বাড়ীতেই থাকে? "হ্যাঁ।"

তাহলে তো রঞ্জনদা আমায় সব কথা বলেনি। বলেছিল শুধু ছোট ছেলেই থাকে বাবার কাছে।

প্রতাপবাবু আবার বলতে শুরু করলেন, "গৌতম যখন চলে গেল তখন ওঁর বয়স ৫০। গৌরব সবে ২৪। এত বড় ধাক্কা ওঁর পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাও দেখছি এখন আস্তে আস্তে সামাল দিচ্ছে।"

ভদ্রলোকের যে কষ্ট হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছিলাম। কথা ঘোরানোর জন্য বললাম, "আপনার মেজ ছেলে কোথায় থাকে?"

"কে বিনয়? ও থাকে দিল্লীতে। সেখানেই সেটেল্ড। দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে। দুজনেই

কমার্স পরছে। বউমা একটা বুটিক খুলেছে। ওরা সারা বছরে এক বার আসে।"

"আর ছোটজন?"

"সে এখানেই থাকে। আগে গৌহাটিতে একটা ব্যবসা ছিল। সিমেন্টের। এখন লোহাগড়ে একটা দোকান খুলেছে। বছর দশেক আগে বউমা মারা যাওয়ায় এখানেই থাকে। মেয়ে কলকাতায় থাকে। ওখানেই মামাবাড়িতে থেকে স্কুলে যায়। ক্লাস টুয়েলভ হল এবার।"

"হুম্। এবার আপনি বলুন আমায় কেন ডেকেছেন?"

"সেটা রঞ্জন আপনাকে প্রায় সবটাই বলেছে। যেটা বলেনি তা হল ওই মূর্তিটার দাম।"

"আইভরির মুর্তি। তেমন দাম তো হবে না।"

"হবে। কারণ ওই মূর্তিটার চোখে দুটো হিরে বসানো আছে। আর দুটো হাত ওপরে তোলা। একটা পাত্র ধরা তাতে। সেখানেও নিখুঁত ভাবে বসানো পাঁচটি হিরে রয়েছে।"

এবার আমি চমকে উঠলাম। বললাম, "তাহলে তো অনেক দাম হবেই।"

"তা তো হবে। তবে সেটা আসল কারণ নয়।"

চশমাটা সামান্য নামিয়ে উনি আমার দিকে তাকালেন, "গোয়েন্দাবাবু। ওই মুর্তি খুঁজতে আমার সেরকম কোন অসুবিধে হত না। কিন্তু আমি অসুবিধেয় সত্যিই পরেছি। আমি যখন তোমায় আমার পরিবারের সবার কথা বললাম, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। এদের মধ্যেই কেও একজন চোর। কিন্তু কে? সবার ধমনীতেই যে আমার রক্ত বইছে।"

"কিন্তু চুরির দিন এদের মধ্যে বাড়িতে কে কে ছিলেন?"

উনি কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "ওহে গোয়েন্দাবাবু, সেদিন সবাই এ বাড়িতে ছিল। সবাই!"

-৫-

খাওয়ার সময় সেই 'সবাই'দের সঙ্গে আলাপ হল। একতলার হলঘরটার ভেতর দিয়ে আরেকটা বড় দরজা খুলে খাওয়ার ঘর। আমায় অবশ্য দোতলায় একটা ঘরে থাকতে দিয়েছে। প্রতাপবাবুর স্টাডি থেকে বেরিয়ে আসার আগে আমি সেই হুমকি চিঠিগুলো চেয়ে নিয়েছিলাম। যে লোকটা কফি নিয়ে এসেছিল, সেই আবার আমায় ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরটা বেশ ভাল। আমার ব্যাগটা আগেই রেখে দিয়েছিল। স্নান করে বেরতেই রঞ্জনদা ঘরে এলো।

"তোমায় একটা কথা বলি। যেহেতু অনেকেই তোমায় দেখেছে সকালবেলা তাই পরিচয় গোপন করার দরকার নেই।"

এটা শুনে আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। তার মানে আমায় সবার সামনেই গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়লাম।

ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে এলাম। সবে সাড়ে বারোটা বাজে। একটু ভাবছি ঘুরব বাড়িটায় তখনই মনে হল কেও সামনের দেওয়ালের আড়াল থেকে আমায় দেখছে।

তক্ষুনি এগিয়ে জেতেই দেখলাম সড়ে পড়ল। কাছে গিয়ে দেখি কেও নেই। অথচ আমি দেখেছি। ভাবলাম এদিকে গিয়ে দেখি কোন দরজা আছে কিনা। তার আগেই পেছন দিকে আরেকটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেলাম। ঘাড় ঘোড়াতেই দেখলাম দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। তবে তার ভেতর দিয়ে একজন জে এদিকে তাকিয়ে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইচ্ছে করেই ওদিকে গেলাম না। বরং শান্ত হয়ে বাড়ির বাইরে গেলাম। গেটের বাইরে দুএকটা কুকুর বসে আছে। ভেতরে খানিকটা দূরে একজন মালী ফুলগাছের পরিচর্যা করছিল। কিছুক্ষণ সেটাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। এই সময় গাড়ির হর্ন পাওয়া গেল।

বাড়ির ভেতর থেকে আরেকটা লোক বেরিয়ে এসে গেট খুলে দিল। দেখলাম একটা ইন্ডিকা এসে ধিরে ধিরে থামল। তারপর তার থেকে একটা ছেলে নেমে এসে দাঁড়াল। আমায় দেখতে পেয়ে তারপর দু একবার তাকিয়ে আবার গাড়ির মধ্যে থেকে একটা খাম বার করে নিল। যে লোকটা গেট খুলে দিয়েছিল, এবার দেখলাম সেই হচ্ছে ড্রাইভার যে সকালে আমায় আনতে গেছিল। ইন্ডিকাটা নিয়ে এবার সে গ্যারেজে ঢোকাবে।

যে ছেলেটা নেমেছিল, সে প্রায় আমারই বয়সী। এসে বলল, "আপনি?"

পরিচয় দিলাম, "আমি রঞ্জনদার সাথে এসেছি সকালে। আপনি?"

"রোহিত সরকার। আমি মিঃ প্রতাপ সরকারের ..."

"নাতি। জানি।"

বুঝলাম দাদুর খুব ন্যাওটা।

শুনে ভুরু কুঁচকালো রোহিত, "কিভাবে জানলেন?"

"সেটা কিছুক্ষণ পরেই বুঝবেন। আপনি আমার চেয়ে খুব বেশি বড় নন। লেটস গেট অন ফার্স্ট নেম টার্মস।"

"ওকে।"

হাঁটতে হাঁটতে দুজনেই ফের বাড়ীতে ঢুকলাম। রঞ্জনদা দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, "চল। লাঞ্চ টাইম।"

খাওয়ার টেবিলটা বিশাল বড়। প্রতাপবাবু আগেই এসে একদম সামনে বসে আছেন। বুঝলাম ভদ্রলোকের সময়জ্ঞান খুবই ভাল।

রোহিত আমার পাশেই বসল। এরই মধ্যে ওঁর সঙ্গে ভাব গড়ে উঠেছে। এখনও যদিও ও জানে না আমার আসল পরিচয়।

এই সময় তিনজন ঘরে ঢুকল। তাদের মধ্যে একজন আমারই বয়সী। রোহিত ডাক দিল, "দিয়া"। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "আমার বোন।"

দিয়া তাকাল। রোহিত যতটা ফরসা, ও ততটা না হলেও ভাইবোনের চেহারায় খুব মিল। তবে দিয়ার মুখে লাবণ্য কম। সামান্য 'হাই' বলে গিয়ে বসে পড়ল।

অন্য যে ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন, তিনি প্রথমেই গিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে দিলেন। বুঝলাম যে তিনি সব পরিপাটি রাখায় অভ্যস্ত। জানলা দিয়ে ঘরে আলো আসায় ঘরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তখনই দুই ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন।

যাকে দিয়া, 'বাবা' বলল তিনিই যে মেজ ভাই তা বলা যায়। পাজামা পাঞ্জাবী পরা। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। চোখে চশমা। আমার দিকে একবার নজর বুলিয়ে প্রতাপবাবুর দিকে তাকালেন।

প্রতাপবাবু এবার নড়ে চড়ে বসতেই সবাই চুপ করে ওঁর দিকে তাকাল। তিনি একবার আমার দিকে মাথা নেড়ে তারপর বলতে থাকলেন, "ইনি মিঃ ঘোষ। আমার মূর্তির ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছেন। যে কদিন থাকবেন, সে কদিন আমাদের গেস্ট।"

কথাটা শুনে সবার মুখের অভিব্যক্তি পড়তে পারলাম না। কারণ আমার পাশে বসা রোহিত হঠাত হো-হো করে হাসতে শুরু করল। বিনয়বাবু অর্থাৎ প্রতাপবাবুর মেজ ছেলে কিছু বলতে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর ছেলের অসভ্যতা দেখে চুপ করে গেলেন।

রোহিত হাসতে হাসতেই আমার ঘাড়ে হাত রেখে বলল, "আর ইউ কিডিং মি? ইনি গোয়েন্দা? আমিই তো ওঁর থেকে সিনিয়র। ও কি গোয়েন্দাগিরি করবে?"

"রোহিত চুপ!", ভদ্রমহিলা ধমকালেন। ওনার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ইনিই বিনয়বাবুর স্ত্রী অর্থাৎ মেঘনা দেবী। নামটা প্রতাপবাবু বলেছিলেন।

মায়ের ধমক খেয়ে রোহিত হাসি থামাল বটে কিন্তু আমার দিকে খুব কৌতূহল নিয়ে তাকাল। প্রতাপবাবু আবার মুখ খুললেন, "ও এই বাড়িতে আজই এসেছে। রঞ্জন ওকে চেনে এবং আমিও চাই ও এই বাড়ির হারানো সম্পদ উদ্ধার করুক।"

"কি দরকার বাবা। ওটা গেছে তো কি হয়েছে। ওটা তো আর তুমি বিক্রি..." বলতে গিয়ে বিনয়বাবু থমকে গেলেন।

মেঘনা দেবী তাঁর দিকে কড়া চোখে একবার তাকিয়ে তারপর বললেন, "এই তদন্ত তো পুলিশই করতে পারে। তুমি এখনও থানায় জানাওনি কেন আমি তাই তো বুঝি না।"

" তুমি বোঝ না এমন কিছু আছে বউমা? তুমি ভালই যান আমি কেন থানায় যাইনি। এবাড়ির..."

"বাবা", যে গলাটা ভেসে এলো সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, বিনয়বাবুর সঙ্গে অন্য যে ভদ্রলোকটি ছিলেন তিনি গিয়ে টেবিলে আমার উল্টোদিকেই বসেছেন। বুঝতে পারা গেল ইনি হচ্ছেন সেই তৃতীয় ভাই।

শ্যামলা, চাপ দাড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, গলার স্বর মোলায়েম। কথাটা বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমিও চোখ সরালাম না। তিনিই আবার প্রতাপবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "গোয়েন্দার দরকার ছিল না। এই চুরি নিয়ে এত জলঘোলা হচ্ছে কেন তা আমি বুঝতে পারছি না। যাকগে, আপনি যখন এসেই গেছেন তখন চোর খুঁজে বের করুন। বাবার কাছ থেকে ভাল রিওয়ার্ড পাবেন।" বলে হেসে সামনের জলের গ্লাস তুলে কিছুটা জল খেলেন। লক্ষ করলাম তাঁর ডান হাতে একটা অদ্ভুত আংটি।

বিনয়বাবুও হেসে এবার বললেন, "এত কম বয়স আপনার, আপনার সাথে খারাপ ব্যাবহার করতে ইচ্ছে করবে না আমাদের মত বুড়োদের। আর আপনি তো সমবয়সী অনেককে পেয়ে গেছেন। রোহিতের সাথে এর মধ্যেই দোস্তি হয়েছে দেখি। তা ভালই কাটাও কয়েকটা দিন। তোমায় তুমিই বললাম অ্যাঁ?"

কথাগুলো যথেষ্ট ঠেস দেওয়া। তাই আমিও হেসে বললাম, "ফুর্তি খুব হবে বলে মনে হয় না। এটা শেষ করেই আমায় আবার দৌড়তে হবে। কাজেই ..."

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বসে পড়লেন। দেখলাম রঞ্জনদাও এদের সাথেই খেতে বসল। চাকররা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তারা এসে পরিবেশন শুরু করল। তখনই প্রতাপবাবু বললেন, "কি শ্রেষ্ঠা? এতক্ষণ একটাও কথা বললি না?", বলে আমার দিকে তাকাল, " আমার ছোট নাতনি। শ্রেষ্ঠা। টুয়েলভে পড়ে।"

যার সাথে পরিচয় করাল, তার দিকে তাকাতেই শরীরে ঝটকা লাগল। প্রথমে যে তিনজন ঢুকেছিল তাদের মধ্যে তৃতীয়জন নিশ্চয়ই এ। সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার হল একটু আগে এই মেয়েটাই আমার দিকে নজর রাখছিল। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে যে সময়টুকু দেখতে পেয়েছিলাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই যে এই সে।

সামান্য হেসে অন্যদিকে মুখ ঘোরালাম। এইটুকুতেই দেখে নিয়েছি যে এ বাড়ির বাকিদের চেয়ে ওঁর চেহারা অনেকটাই আলাদা। ধপধপে ফর্সা, চোখ দুটো কড়া নীলচে,

অসামান্য সুন্দর চেহারা, তাঁর ওপর যেভাবে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে তাতে চোখ সরানো মুশকিল হবে। আমার হাসির জবাব এলো না। তাই আমিও রোহিতের দিকে তাকিয়ে অন্য কথা তুললাম।

খাওয়ার ঘর থেকে বেড়িয়েও অনেক্ষন অন্যমনস্ক ছিলাম। কারণটা সহজেই বোধগম্য।

-৬-

বাগানে বসে এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাত একটা আওয়াজে চমকে উঠলাম। দেখি শ্রেষ্ঠা দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, "গুড মর্নিং"।

সম্ভাষণ ফিরিয়ে দিয়ে আমার পাশেই বসলো। এই সাতসকালে ওকে যেন আরও ফর্সা লাগছে। তাকিয়ে থাকতে খুব ইচ্ছে করলেও, আমি অন্য দিকে তাকালাম।

"হোম্‌স না মিটার?", প্রশ্নটা শুনে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও একটু হেসে বললাম, " কোনটাই নই। এমনকি জেমস বন্ডও না।"

ও এবার হেসে ফেলল। হাসলে যে ওকে সুন্দর দেখায় তা নিশ্চয়ই ওঁর জানা। হাসির প্রচ্ছন্নতা এতটাই গভীর যে কিছুক্ষণ একমনে সেটা শুনছিলাম। ওঁর ঠেলা পেয়ে নড়ে চড়ে বসলাম।

সামান্য কথার পর উঠে বলল, "তোমায় তুমি বলতে পারব?"

"অবশ্যই। তা চলে যাচ্ছ নাকি?", প্রশ্নটা করেই জিভ কাটলাম।

শ্রেষ্ঠা কিন্তু আবারও হেসে বলল, "আহা। একেবারে কোথাও যাচ্ছি না।"

ওঁর চলে যাওয়াটা দেখতে দেখতে হাজারো চিন্তা পাক খাচ্ছিল মাথায়। সেগুলো ঝেড়ে আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

প্রাতরাশের পর সারা সকাল জুড়ে আমি বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। সঙ্গে শ্রেষ্ঠা। মেয়েটা এর মধ্যেই আমার সাথে মানিয়ে নিয়েছে। অথচ ওকে এখনও জিজ্ঞেস করিনি কেন গতকাল আমায় লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। দোতলায় আপাতত একটা ঘরে বিনয়বাবু সস্ত্রীক রয়েছেন। তাঁর পর দুটো ঘর ফাঁকা। বারান্দার পাশ দিয়ে ঘুরে প্রথম ঘরটায় আমি ও পরেরটায় রোহিত এবং দিয়া।

একতলায় প্রতাপবাবুর স্টাডির পাশেই একটা ঘরে থাকে গৌরব। ওঁর জন্য একজন আয়া রয়েছে যে সারাক্ষণ ওঁর সঙ্গেই থাকে। পাশের ঘরেই প্রতাপবাবু থাকেন। তার পাশের ঘরটায় শ্রেষ্ঠা ও তাঁর বাবা।

ডাইনিং হলের বাঁদিকে একটা বারান্দা। সেখানে একটা ছোট গেট রয়েছে। সেটা খুলে আমরা বাইরে এলাম। এখানে বাগানটা ভর্তি শুধু রঙ্গন আর পাতাবাহার গাছে। কয়েকটা রঙ্গন নিয়ে শ্রেষ্ঠা চুলে গুঁজতে লাগল।

"ওপাশের ঘরগুলো কাদের?"

"ওটা আউটহাউস। কাজের লোকরা, মালী ওখানেই থাকে।"

এদিক ওদিক দেখে এগিয়ে গেলাম। আউটহাউসের পাশের দেওয়াল ঘেঁষে এক জায়গায় একটা বিরাট গাছ গজিয়েছে।

"ওদিকটায় যেও না। সাপ থাকতে পারে।", শ্রেষ্ঠার কথায় আর পা বাড়ালাম না। ঘুরে দেখি তখনও চুলে ফুলগুলো লাগাতে পারেনি। হেসে আমি কিছু বলতে যাব, এই সময় বাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এলো। যাকে বলে আর্তনাদ।

-৭-

রুদ্ধশ্বাসে ডাইনিং হলে ঢুকতেই দেখলাম, ওপরে ওঠার সিঁড়িটার নিচে জটলা। চন্দ্রিলবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। বিনয়বাবুও ঝুঁকে আছেন। মাটিতে যে পড়ে রয়েছে তার পিঠটা দেখা যাচ্ছে।

সামনে গিয়ে দেখলাম গৌরব। উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। চিৎ করে দিতেই দেখলাম শরীরের বাইরের অংশে কোন চোট নেই। পালস্ সামান্য দ্রুত।

মুখ না তুলেই বললাম, "ওকে যেই ডক্টর চেক্ আপ করেন তাকে এক্ষুনি ফোন করুন।"

ততক্ষণে প্রতাপবাবু এসে গেছেন। তিনি শুধু খুব ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে?"

বিনয়বাবুই উত্তর দিলেন। গলার আওয়াজে বুঝলাম এই বয়েসেও তিনি বাবাকে সমীহ করেন।

"আমি বারান্দায় ছিলাম। একটা আওয়াজ পেয়ে ছুটে এলাম। আসতেই দেখলাম মেঘনা চিৎকার করল। গৌরব পড়ে আছে। হুঁশ নেই।"

মেঘনাদেবী এতক্ষণ পর আবার এলেন। শেষ কথাটা শূনে বললেন, "আমি দিয়াকে খুঁজছি এমন সময় আওয়াজ পেলাম। এসে দেখি ও ..."

এই সময় আমি হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, "আপনি যখন আওয়াজ পেলেন তখন আপনি ঠিক কোথায় ছিলেন?"

ঝঠ করে আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "দিয়াকে খুজছিলাম। এই তো বাইরের দরজার কাছে।"

"হুম্।", বলে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর দেখলাম রোহিত সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, "ডক্টরকে পেলে না?"

"ফোন করেছিলাম। আসছে পনেরো মিনিটের মধ্যে।"

"লোহাগড়েই থাকে। এ বাড়ির সব চিকিৎসার দায়িত্ব ওঁর।", প্রতাপবাবু বললেন।

আমি আর রোহিত ধরাধরি করে গৌরবকে ওঁর ঘরে নিয়ে গেলাম। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যখন বেরচ্ছি তখনও ডাক্তারের দেখা নেই।

রোহিত চলে যাচ্ছিল। আমি ওকে ডেকে বললাম, "একটু বাইরে এসো তো।"

ও একটু অবাক হয়ে পেছন পেছন এলো। বারান্দায় ভর দিয়ে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি তখন দোতলায় ছিলে?"

"কখন? ও হ্যাঁ। আমি ওপর থেকে নিচে নামছিলাম। ভাবছিলাম একটু বেরিয়ে আসব"

"তুমি নামতে নামতেই তো..."

"হ্যাঁ। দেখলাম বড়দা পড়ে রয়েছে।"

"মনে কর তো তখন কেও কি সিঁড়ির কাছে ছিল?"

"নাহ। একদম খালি। ও পড়তেই মা ঢুকল।"

"তুমি কি তার আগে ঘরেই ছিলে?"

"হ্যাঁ। একা একা গিটার বাজাচ্ছিলাম।"

"ঘর থেকে যখন বেরোলে তখন কি কাউকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে দেখেছিলে?" "নাহ",বলেই ওঁর খেয়াল হল, "কি ব্যাপার? তুমি কি বলতে চাইছ যে বড়দাকে কেও ধাক্কা মেরে ফেলেছে?"

উত্তর না দিয়ে চলে এলাম। কারণ দেখলাম বাইরে গাড়ি থেকে একজন লোক নামছে। অবশ্যই ডাক্তার হবে কারণ এক হাতে একটা ছোট কিট ব্যাগ।

-৮-

ডঃ সোম নামক ডাক্তারটি গৌরবকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করল। এর মধ্যেই ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে। শরীরে কোথাও কেটে,ছড়ে যায়নি কিন্তু কনুইয়ে চোট রয়েছে। এছাড়া কপালের ডান পাশটা খানিকটা দেখলাম ফুলে গেছে।

একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে ডঃ সোম ওকে বলল খেয়ে নিতে। তারপর ঘুম এসে যাবে।

এই সময় প্রতাপবাবু মুখ খুললেন, "কিন্তু ডাক্তারবাবু, ওঁর হঠাত কি হল? এরকম ভাবে পড়ে গেল কেন? আর ও দোতলায় কি করতে গিয়েছিল? হুইলচেয়ার তুলল কে?"

এখানে চন্দ্রিলবাবু বল উঠলেন, "ওকে আমিই নিয়ে গেছিলাম। আমায় বলল যে ছাদে যাবে।" কথা শেষ করলেন না উনি।

প্রতাপবাবু গৌরবের আয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কোথায় ছিলে?"

"বাবু, আমি তো নিচেই ছিলাম। দাদাবাবুর জামা কাপড় কাচতে দেওয়ার জন্য ..."

"কিন্তু ও এভাবে পড়ল কেন? কি ডঃ সোম? কি বুঝলেন?", ঘরের মধ্যে সকলেই ছিল তাই

এ গলাটা বিনয়বাবুর সেটা বুঝলাম। তাঁর কারণ আমি তখন ঘরের এককোনায় হুইলচেয়ারটা পরীক্ষা করছি।

ডঃ সোম উত্তর দিলেন, "দেখুন। এটা কনকাশনের জন্য হয়নি। হয়তো একটা ছোট অ্যাটাক হয়ে গেছে। তবে হি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার নাও।"

"হয়তো। আবার নাও হতে পারে।", হঠাৎ আমার গলায় সবাই চমকে উঠল।

"মানে?", প্রতাপবাবু জানতে চাইলেন।

"ওঁর হুইলচেয়ারটাকে কেও ট্যাম্পার করেছে। এই যে পেছনের গ্রিপটা ভাঙ্গা। আর এই চাকাটায় কোন হাওয়া নেই। ও সম্ভবত সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছিল না। ও চেয়ারটা ঘোরাতে যাচ্ছিল। তাই মুখ থুবড়ে পড়ে।"

"কি বলতে চাইছ? ওকে কে মারতে চাইবে? নিষ্পাপ শিশু।"

"খুনিরা কিন্তু অনেককেই মেরে ফেলে। ওদের চোখে সবাই এক। তাই ..."

বিনয়বাবু এবার গলা চড়ালেন, "কে? কে করবে এটা? এখানে সবাই এক রক্তের?"

আমি ঠাণ্ডা গলাতেই বললাম, "এখানের কেও করেছে আপনাকে কে বলল? বাইরের লোক তো এখানে সহজেই ঢুকতে পারে।"

আমার এই কণ্ঠস্বর শুনে একটু দমে গেলেও বিনয়বাবু আবার বললেন, "এখানে আপাতত বাইরের লোক বলতে আপনিই।"

"সেই সময় আমি আপনার ভাইঝির সাথে বাগানে ছিলাম। আর আমি এখানে অন্য কাজে এসেছি। আপনাদের সাহায্য করতে। বিপদ আনতে না।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ডঃ সোম বললেন, "আমি এবার উঠলাম। গৌরবকে ওঁর ওষুধগুলো ঠিকঠাক করে খাওয়াবেন।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে গেল। তারপর যখন সবাই বেরচ্ছে তখন মেঘনাদেবী বললেন, "বাবা। আপনি সবাইকে নিয়ে একবার একটু বাইরের ঘরে আসবেন?"

এক এক করে সবাই ঢুকল। আমি যখন ঢুকতে যাব, হঠাত মেঘনাদেবী বলে উঠলেন, "তুমি এখানে না থাকলেও হবে ..."

"আপনি গৌরবের ঘটনাটা নিয়েই যখন কথা বলবেন তখন আমার থাকা উচিত। আফটার অল আমিই তো প্রথমে প্রমাণ করলাম যে এটা দুর্ঘটনা নয়।"

"তুমি কি করে বুঝলে যে আমি ওই ঘটনা..."

কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি বললাম, "এ বাড়িতে এরকম সমায়েত এর আগে হয়নি। তাই কারণটা অনুমান করা সহজ।"

আমি কি করে সেটা জানি তা আর জিজ্ঞেস করলেন না। আমি দিয়ার পেছন পেছন ঘরে ঢুকলাম।

এক কোনায় প্রতাপবাবু একটা বিরাট চেয়ারে বসে। তাঁর ডান পাশে রোহিত ও চন্দ্রিলবাবু। দরজার উল্টোদিকে বিনয়বাবু একটা কাউচে বসে আছেন। প্রতাপবাবুর বাঁ পাশে একইরকম আরেকটা কাউচে দিয়া ও শ্রেষ্ঠা পাশাপাশি বসল। মেঘনাদেবী দাঁড়িয়ে থেকেই বলতে শুরু করল।

"আমার মনে হয় এই ঘটনার পেছনে বাইরের নয় ভেতরের লোকেরই হাত রয়েছে। এবং আমি এখানে প্রস্তুত কারও ব্যাপারে কিছু বলছি না।"

এইবার পরিষ্কার বুঝলাম যে পরিবারের সবার মধ্যে মতের মিল নেই। নাহলে উনি একথা কোনদিন বলতেন না।

"তাই বাবা, আমার মনে হয় তুমি ওই আয়াটাকে ছাড়িয়ে দাও। কত স্পেশাল কেয়ার হোম রয়েছে, ইউ নো ফর ফিজিক্যালি হান্ডিক্যাপ্ড। সেখানে গৌরবকে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়।"

ভেবেছিলাম প্রতাপবাবু হয়তো রেগে যাবেন। কিন্তু আশ্চর্য, উনি শুধু বললেন, "বউমা। এ ব্যাপারে তুমি আগেও অনেকবার বলেছ। কিন্তু ও তো তোমাদের কোন ট্রাবল দিচ্ছে না। আমার কাছে ভাল আছে।"

এই সময় চন্দ্রিলবাবু বলে উঠলেন, "বউদি, তোমরা এখানে এসেছ কদিনের জন্য। তরশুই চলে যাবে। দিয়া, রোহিত ব্যাস্ত হয়ে পরবে। আমার মেয়েটাও কদিন পর কোথায় পরতে যাবে কে জানে? এই সময় এই সব কথার কি মানে?"

"চন্দ্রিল। তুমি বুঝতে পারবে না। কারণ তুমি এ বাড়িতে..."

"বউমা!", প্রতাপবাবু গর্জে উঠলেন। উঠে দাঁড়িয়ে এবার উনি বললেন, "সবাই যাও। আর কোন কথা নেই।"

মেঘনাদেবীর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে উনি আসল কথাটাই বলতে পারলেন না।

শ্রেষ্ঠা আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। কিন্তু আমি যায়গাতেই বসে রইলাম। খানিক্ষন পড়ে উঠে প্রতাপবাবুর স্টাডিতে গেলাম।

দরজা ভেজানোই ছিল। আমি টোকা দিতেই আওয়াজ পেলাম।

চেয়ারে বসে বললাম, "আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।"

"বলুন।"

"প্রথমেই বলে রাখি আমার কথায় আপনি খারাপ পেতেও পারেন। কিন্তু তদন্তের খাতিরে আপনাকে কিছু জিনিস বলতেই হবে।"

"বলুন"

"আপনার উইলে কি আছে?"

"কেন?"

"কারণ এটা জরুরি।"

"তা হলে বলে রাখি, আমার জমিজমা এবং টাকাপয়সা সব গৌরবের নামে করা আছে। বাকি অর্থাৎ বাড়িটা দুই ভাগে ভাগ করা। অর্ধেক অর্ধেক। রোহিত ও গৌরবের নামে। ও হ্যাঁ কিছু টাকাপয়সা ও গয়নাগাটি দিয়া ও শ্রেষ্ঠার নামে আছে।"

"কেন? নাতনিরা বাড়ি পাবে না কেন?"

"কারণটা বলা যাবে না।"

"এই উইল কি সবাই জানে?"

"হ্যাঁ। সবাই এটাই জানে।"

"তাহলে চন্দ্রিলবাবু? উনি তো এবাড়িতে থাকেন। ওনার কোন প্রাপ্য নেই?"

"না। কিন্তু আমি আপনাকে চুরির তদন্ত করতে..."

"হ্যাঁ। এটাও তদন্তের অঙ্গ। এবার আপনাকে একটা খবর দিই। এটা প্লিজ কাউকে বলবেন না। আপনার নাতিকে কেও খুন করার চেষ্টা করেছে।"

"মানে?"

"উত্তেজিত হবেন না। আমি ইচ্ছা করেই আজকে উইলচেয়ারটা কাউকে দেখতে দিইনি। ওটার পেছনের অ্যাক্সেলটা কেও করাত দিয়ে ঘষে কেটে দিয়েছে।"

"কি! কি বলছ তুমি?", অজান্তেই আমায় আবার তুমি সম্ভাষণ শুরু করলেন প্রতাপবাবু।

"হ্যাঁ। আচ্ছা। আসি।"

ঘরে গিয়ে ল্যাপটপ খুললাম। কিছুক্ষণ অ্যাসাসিনস্ ক্রীড খেলে দেখলাম মনোযোগ দিতে পারছি না। তাই ল্যাপটপে ভাবলাম কোন বই পরি। কিন্তু স্ক্রিনে তাকাতে ইচ্ছা করছে না। অগত্যা বন্ধ করে ব্যাগ থেকে একটা বই বের করলাম। এই একটাই এবার নিয়ে এসেছিলাম। আগাথা ক্রিস্টির 'ক্রুকেড হাউস'।

বহুবার পড়া। কিন্তু এবার পড়তে পড়তে হঠাত কেমন যেন চমকে উঠলাম। খানিক পাতা উলটে, খামচা খামচি করে পড়ে যখন বইটা রাখলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ একমনে চিন্তা করে নিয়ে উঠলাম। কফি খেতে ইচ্ছে করছিল। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। একজনের কথা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। বইটা পরার পর থেকেই।

-৯-

বাইরে তখন অন্ধকার নামবে। পাখিদের আওয়াজ বেড়ে গেছে। দুরের রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। বাঁদিকের জলাভূমির দিকটায় পাখিরা উড়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারে ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছিল চারপাশ। এই সময় খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক মনে প্রকৃতির ভাষায় নিজের প্রচ্ছদপট আঁকা যায়। অথচ এ বাড়ির এক একজনের রূপ-প্রতিরূপ এতটাই মায়াবী যে আমার মনে অন্য চিন্তা আসছিল না। যেভাবেই এগোই আমি এই মামলায় একই যায়গায় ফিরে আসছি। তাই সামনের প্রেক্ষাপট আমার চশমার ভেতর দিয়ে চোখে ঢুকলেও মনের গভীরে যাচ্ছিল না। তবে হ্যাঁ, এখানে আমি বেড়াতে আসিনি তাই...

চিন্তায় বাধা পড়ল। ডান কাঁধে আলতো চাপ পড়ায় সেদিকে তাকালাম। শ্রেষ্ঠা। ধোঁয়া ওঠা একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, "কফি। ব্ল্যাক!"

"থ্যাঙ্ক ইউ", বলে আবার বাইরে তাকালাম।

ওর বোধহয় আরও কিছু বলার ছিল। কিন্তু আমার গাম্ভীর্য দেখে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। দু একবার কিছু বলার জন্য মুখ খুলেও বলল না। অগত্যা আমিই বললাম, "কিছু বলবে কি?"

"হ্যাঁ! মানে না ... ইয়ে ..."

"বলতে পার। কান খোলা।"

ও একটুক্ষণ চুপ করে তারপর বলল, "আজ দুপুরে যখন সবাই ড্রইং রুমে থেকে চলে গেল, তুমি থেকে গেলে কেন?"

"বসে বসে চিন্তা করছিলাম। একটা খটকা লেগেছিল। আমি কে কি বলছে তার দিকে বেশী নজর দিইনি। আমি অন্যদের চেহারাগুলো লক্ষ্য করছিলাম। কোন বেফাঁস মন্তব্য করলেই দোষীর মুখে কিছু না কিছু পরিবর্তন হবেই। আর সেখানেই খটকা..."

"কার দিকে নজর ছিল তোমার? নিশ্চয়ই ..."

"সবার দিকে। সবাই। এমনকি ..."

"আমার দিকেও?"

"অবশ্যই!", বলে ওঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। একই সময় ও ঘুরল এবং আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল দু - মিনিটের জন্য। কিন্তু তার পর আবার সোজা আমার চোখের দিকে তাকাল।

স্থির। চোখে পলক পড়ছে না। এক হাত রেলিঙের ওপর। একটুও নড়ছে না। চোখ বলছে কিছু লুকোনোর নেই অথচ একটা অন্য ব্যাপার রয়েছে। শ্রেষ্ঠার চোখে চোখ রেখে বললাম, "কিন্তু এখনও বললে না তো।"

"কি বললাম না?"

"যেটা বলতে এলে।"

"ওহ... না ব্যাপার হচ্ছে কি ... মানে আসলে আমি... মানে আমি ..."

"ভয় পাচ্ছ। তাই তো?"

ও একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকাল। তারপর মৃদু হেসে আবার বাইরের দিকে তাকাল। এই শেষ আলোতেও বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম যে ওঁর

চোখ জ্বলজ্বল করছে। এরপর যে কথাটা বলল সেটা মনে হল দুরের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে।

"আমার মনে হয় এই রহস্যের কোনদিন সমাধান হবে না। আর সেটাই ভয়ের।"

আমিও বাইরের দিকে চোখ রেখে বললাম, " কেন? হবে না কেন? আর ভয় কেন?"

শ্রেষ্ঠা এবার আবার আমার দিকে ফিরল, " বুঝতে পারছ না? এই দুদিনে তুমি নিশ্চয়ই বুঝে গেছ যে এ বাড়ির কোন লোকই দোষী। এই ঘটনার পেছনে কার হাত আছে কেউ জানে না। আর যদি কোনদিন না জানে তাহলে ... তাহলে সে আমাদের মধ্যেই থাকবে। দোষী সাব্যস্ত না হলে সে তো অনেক কিছু করতে পারে ..."

"তাহলে আমার ওপর আস্থা নেই? বাঃ। ভাল!"

এ কথা শুনে শ্রেষ্ঠা তক্ষুনি হেসে ফেলল। তারপর নিচু গলায় বলল, " আমি জানি তুমি কাকে সন্দেহ করছ।"

"তোমাকে!"

"কি? মাথা খারাপ নাকি?"

"এ ব্যাপারে নয়। আমি তোমায় অন্য ব্যাপারে সন্দেহ করছি।"

"কোন ব্যাপার?", হঠাৎই কণ্ঠস্বর মোলায়েম।

এবার আমার হাসির পালা। তাই কফিতে আরেক চুমুক দিলাম। ও আবার জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দিলাম না। বাধ্য হয়েই প্রসঙ্গ পালটাল।

"আচ্ছা তোমার কি মনে হয় এই সমস্ত ঘটনার ব্যাপারে কেও কিছু লুকচ্ছে বা জেনেও চুপ করে বসে আছে?"

আমার কপালে একটা মৃদু ভাঁজ পরেছিল। কিন্তু তা কাটিয়ে উঠে আমি বললাম, " এই ব্যাপারে কিনা জানি না। তবে এ বাড়ির সবাই কোন না কোন কথা গোপন করেছে। সবাই!"

ওর দিকে ফিরে চোখে হাসি এনে বললাম, "তুমিও। ইয়েস। আই নো দ্যাট!"

ভেবেছিলাম ও হয়তো মানবে না। অথবা হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমায় অবাক করে দিয়ে ও নিচের দিকে তাকাল। তারপর আবার বাইরে দৃষ্টিনিবেশ করল। এই অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে ওর ফরসা মুখ এক লহমায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

বারান্দার রেলিঙে কনুই দুটোর ওপর ভর দিয়ে কফিতে চুমুক দিলাম। তারপর বললাম, "এই সমাজে তিনজনের কাছে কখনও মিথ্যে বলতে নেই। বলতে পারবে কারা?"

শ্রেষ্ঠা মাথা নাড়ল। আমি উত্তর দিলাম, "ডাক্তার, শিক্ষক এবং উকিল।"

ও আরেকটু কাছে এগিয়ে এসে বলল, "কিন্তু এক্ষেত্রে তুমি তো কোনটাই নও।"

"ঠিক। আর এজন্যই সবাই আমায় কিছু না কিছু মিথ্যে বলেছে। কিন্তু যেহেতু আমি এক্ষেত্রে গোয়েন্দা, তাই আমি সত্যিটা খুঁজে বের করবই।"

শেষ কথাটা কতটা দৃঢ়ভাবে বললাম তা বুঝিনি কিন্তু শ্রেষ্ঠা আর কথা না বলে, এসে ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল। খালি কাপটা ওর হাতে দিয়ে একটাই কথা বললাম।

"এক্সেলেন্ট কফি!"

জবাবে অনেক্ষন পর সেই সুন্দর হাসিটা দেখলাম।

-১০-

পরদিন ঘুম থেকে খুব তাড়াতাড়ি উঠলাম। সবে ভোর হচ্ছে। কিছুক্ষণ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তারপর আবার এসে বিছানায় শুলাম। চশমাটা খুলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম সিলিঙের দিকে।

কাল বইটা পড়ে একটু অন্যরকম লাগছে। ঘটনায় খুব বেশি মিল নেই কিন্তু ও বাড়ির চরিত্রদের সাথে এ বাড়ির খুব মিল। লিওনাইডস পরিবারের সবাই ঠিক এভাবেই আচরণ করছিল কর্তার মৃত্যুর পর।

ব্রেকফাস্টের সময় আবার সবার সঙ্গে দেখা হল। মেঘনাদেবী হঠাৎ দেখলাম আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার শুরু করল। বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। আরও ফলের রস নেব কিনা, ঠাণ্ডা জল লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। শ্রেষ্ঠা দেখলাম একদম চুপ। প্রতাপবাবুও গম্ভীর। বিনয়বাবু আর রোহিত আজকের থেকে শুরু হওয়া ইন্ডিয়া-ইংল্যান্ড টেস্ট ম্যাচ নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছেন। মাঝে মাঝে চন্দ্রিলবাবুও এক দুটো কথা বলছিলেন। দিয়া মোবাইলে ব্যাস্ত।

খেয়ে দেয়ে ওপরে ঘরে ঢুকতেই দেখলাম মেঝেতে একটা কাগজ পড়ে রয়েছে। খুলে দেখি তাতে এক লাইন হুমকি - ' ওহে গোয়েন্দা, এই বাড়িতে নাক না গলিয়ে নিজের চরকায় তেল দাও '।

মনে মনে হাসি পেল। উইলচেয়ারের কীর্তি ধরে ফেলাতেই অপরাধী ঘাবড়ে গেছে। এই সময় দেখলাম শ্রেষ্ঠা আসছে।

ওকে চিঠিটা দেখালাম। দেখেই বলল, "এটা কি?"

"হুমকি। টিকটিকি লেগেছে দেখে টনক নড়েছে। হাতের লেখাটা চেন?"

"নাহ। কিন্ত, কোথায় পেলে?"

"দরজার নিচ দিয়ে দিয়ে গেছে।"

"মাই গড!"

"কাউকে কিচ্ছু বলবে না। কাউকে না।"

"ওকে।"

যদিও হাতের লেখা ভাঁড়ানো হয়েছে বোঝাই যাচ্ছিল। একেবারে কাঁচা হাতে লেখা এমন মনে হচ্ছিল। যাই হোক সেটা আমি পার্সে রেখে তারপর চারপাশে তাকালাম। শ্রেষ্ঠা চলে গেছে। আমি ঘুরে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম। এদিকটায় আউটহাউসটা বাঁদিকে পড়ে। সোজা ঘুরতে ঘুরতে আমি ডানপাশে চন্দ্রিলবাবুর জানলার কাছে এলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম ভেতরে কেও নেই। ঝট করে জানলাটা বাইরে দিয়ে খুলতে গিয়েও পারলাম না। অগত্যা ফিরব এমন সময় জানলার নিচে চোখে পড়ল কতগুলো পায়ের ছাপ। কিছুটা দূরে গিয়ে ঘাসের ওপর মিলে গেছে।

মোবাইলে সেটার একটা ছবি নিয়ে নিলাম। তারপর নিজের মনেই হাঁটতে হাঁটতে আউটহাউসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। এপাশটা আগাছায় ভর্তি। তার মাঝে পর পর দু তিনটে ঘর। আমি এসে একটা ঘরের দরজায় টোকা দিলাম।

সামান্য পরেই যে লোকটা বেরিয়ে এলো তাকে প্রতাপবাবু বিষ্ণু বলে ডাকেন। বয়স চল্লিশের ওপারে। শুঠাম স্বাস্থ্য। আমাকে দেখেই সেলাম করল। আগেই লক্ষ করেছিলাম বিনয়বাবু কাজের লোকদের সঙ্গে ব্যবহারটা ভাল করেন না। তাই একটা একশ টাকার নোট এগিয়ে দিলাম।

লোকটা হকচকিয়ে গেল। কিন্তু সে বুদ্ধিমান। এসেই নোটটা মুঠো করে নিয়ে নিল। তারপর আমার দিকে অন্য ভাবে তাকিয়ে বলল, " কি করতে হবে বাবু? "

ওঁর প্রশ্ন শুনে হাসি পেল। পকেট থেকে আরও একটা নোট বের করে বললাম, "কিছু খবর দাও। তাহলে আরও আসবে।"

"বলুন বাবু।"

"এ বাড়িতে হঠাৎ এই সময় সবার জমায়েত হওয়ার কারণটা কি?"

"জানি নে বাবু। তবে..."

আরেকটা নোট এগিয়ে ধরতেই লোকটা ঢোঁক গিলল। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, "বাবু আপনি যেইদিন এলেন তার আগেরদিন কাকিমার সাথে মেজদাদাবুর খুব কথা কাটাকাটি হয়েছে।"

"কি নিয়ে? কিছু কানে এসেছিল কি?"

"তা বাবু, 'উই' নিয়ে কি বলছিলেন। কি নাকি পালটাতে হবে।"

"আর কিছু?"

ইতস্তত করে সে আবার এদিক ওদিক তাকাল। এবার দুটো নোট ধরাতেই বলল, "বাবু, আর

কাউকে বলিনি। মেজবাবু বলছিলেন, 'ওকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি'"

চমকে উঠলেও আর কিছু না বলে ওকে যেতে বললাম। তারপর ঘুরে বাইরে আসতেই দেখলাম রোহিত গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমায় দেখেনি। ড্রাইভার বাগানের এক কোনে গিয়ে বসল।

আমি ওখানে গিয়ে বসে বললাম, "দাদা, কাছাকাছি চায়ের দোকান আছে?"

"নাহ। এই তল্লাটে কোন দোকান নেই স্যার। আপনাকে লোহাগড় যেতে হবে।"

এর সাথে বেশিক্ষণ কথা বলা গেল না। হতাশ হয়ে উঠে পড়লাম। হলে ঢুকতেই দেখলাম, গৌরব একদিকের বারান্দায় বসে বসে বই পড়ছে।

সামান্য দুএকটা কথা বলে আমি আবার সামনের দরজার কাছে চলে এলাম। তখনই দেখলাম ওঁর ঘরের দরজাটা ভেজানো। কৌতূহল নিয়ে ঢুকে এদিক ওদিক দেখে যখন ফিরে আসছি তখন টেবিলের দিকে আবার নজর পড়ল। তাতে একটা ওষুধের স্ট্রিপ দেখা যাচ্ছে। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার খুব মনে আছে ডঃ সোম ওকে যে ওষুধটা খেতে বলেছিলেন তা অন্য। স্ট্রিপ দুটো পকেটে ভরে বেরিয়ে এলাম। ওঁর টেবিলে আগের যা ওষুধ আছে তাতে ওঁর হয়ে যাবে। প্রতাপবাবুর ঘরে টোকা দিলাম।

ভেতরে রঞ্জনদা ছিল। আমায় দেখে জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার?"

আমি উত্তর না দিয়ে বললাম, "আপনি এখনই কাউকে দিয়ে গৌরবের ওষুধটা নিয়ে আসুন। আর কালকেরগুলো কে এনেছিল?"

"কেন? মাধব। মানে ড্রাইভার। আধঘন্টার মধ্যেই নিয়ে এলো।"

"ওকে বলবেন মেমোটা দেখাতে।", বলে ঘটনাটা বললাম।

রঞ্জনদা মাথা নেড়ে বলল, "গণ্ডগোল হতেই পারে। মাধব তো আর দেখেনি।"

মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলাম। সবে মাত্র এগারোটা বাজে। কিছুক্ষণ ঘরে গিয়ে চিত হয়ে শুয়ে রইলাম। এ বাড়িতে বেশ কিছুদিন থাকা হয়ে গেল, কিন্তু রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। অগত্যা আবার আগাথা ক্রিস্টি হাতে নিলাম। এই মুহূর্তে নিজেকে গল্পের কথক চার্লসের মতই মনে হচ্ছে। কিন্তু সেখানে সোফিয়া ...

দরজায় শব্দ করে ঢুকল শ্রেষ্ঠা। আমায় শুয়ে থাকতে দেখে বলল, "চল, খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।"

আমি তাও নড়িনি দেখে এসে এক হাত ধরে টান দিল। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লাম। আমার চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেলেও কিছু বলল না। হাসি পেয়ে গেছিল। ও সেটা দেখে বলল, "কি হল?"

"কিছু না।"

আমার হাতে একটা ঘুষি মেরে বলল, "চলো চলো।"

কথা বলতে বলতে নামছিলাম দুজনে। বারান্দায় দেখি দিয়া গৌরবের সঙ্গে কথা বলছে। আমাদের দেখে চুপ হয়ে গেল। আমি গম্ভীর মুখে ডাইনিং হলে ধুকে বসে গেলাম। অন্যসময় রোহিত আমার পাশে বসে। আজ শ্রেষ্ঠা বসল। অন্য দিকে চন্দ্রিলবাবু।

সামান্য এক দুটো কথা হচ্ছিল। শ্রেষ্ঠা একনাগাড়ে আমার সাথে কথা বলছে। আমি এক দুটো জবাব দিয়ে সবার মুখ লক্ষ্য করছিলাম। প্রতাপবাবু গোমড়া হয়ে বসে আছেন।

এই সময় হঠাৎ চন্দ্রিলবাবু আঁতকে ওঠার শব্দ করলেন। তাকিয়ে দেখালাম তিনি তার ডালের বাটিটার মধ্যে তাকিয়ে রয়েছেন।

দেখলাম স্বচ্ছ ডালের মধ্যে বাটির নিচে দুটো ছোট দানা। বোঝা যাচ্ছে ও দুটো কোন ট্যাবলেটের শেষ হয়ে আসা অংশ।

খাওয়া মাথায় উঠল। চন্দ্রিলবাবুকে বললাম বাটিটা টেবিলে রাখতে। তারপর হাত ধুয়েই দৌড়ে ওপরে চলে গেলাম। আমার ব্যাগ থেকে কিটটা নিয়ে নামতে লাগল ঠিক দু মিনিট। তারপর কাজে লেগে গেলাম। গ্রিন টেস্ট কিটটা ব্যবহার করা এখন আমার কাছে জলভাত। প্রথমে একটা ছোট কাচের চামচ দিয়ে ট্যাবলেটটা ধরলাম। অন্যটা প্রায় গলে গেছে। তারপর আস্তে করে আরেকটা টুইজার দিয়ে অনেক কষ্টে তুললাম। সেটা একটা স্লাইডে রেখে তার থেকে সামান্য যে ডাল লেগে ছিল তা সরিয়ে দিয়ে ডিটেক্টরটা অন করলাম। একটু স্যাম্পল দিতেই তা সবুজ হয়ে উঠল। এবার সেকেন্ড পাইপের মধ্যে আরও খানিকটা ঢালতেই নিচের ডিসপ্লে স্ক্রিনে একটা লাইট জলে উঠল। সেটা গিয়ে হলুদ রং করা গ্রাফের নিচে দাঁড়াল।

মুখ তুলে এবার বললাম, "আপনাররা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা কি। খুব কড়া বিষ। সম্ভবত স্ট্রিকনিন এবং ফেরো সায়ানাইডের মিক্সচার।"

রোহিত অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। এবার বলল, "এটা কি ফ্যাটাল হতে পারে?"

"অবশ্যই ফ্যাটাল। বরাতজোরে চন্দ্রিলবাবু বেঁচে গিয়েছেন বরাতজোরে"

"কিন্তু কিন্তু, আমরা তো অনেকেই ডাল খেয়েছি।", রঞ্জনদা ভয়ার্ত স্বরে বলল।

"না। ওটা শুধুই চন্দ্রিলবাবুর বাটিতে ছিল। দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে ট্যাবলেটটা ওখানেই ফেলেছে কেউ।"

প্রতাপবাবু এবার কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। চোখ জ্বলছে। বললেন, "কে করেছে এই কাজ?"

"বাবা। আগে খেয়ে নাও।", বিনয়নবাবু শান্ত ভাবে বললেন।

রঞ্জনদা ও গৌরব মিলে ওনাকে শান্ত করে বসাল। সব খাওয়ার ভাল ভাবে দেখে নেওয়া হল। আমি যদিও জানি আর বিষ থাকবে না এখন।

দিয়া বলল, "প্রথমবার এবাড়িতে খুনের চেষ্টা হল।"

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, "প্রথমবার নয়"।

-১১-

খাওয়ার পর আমি সটান প্রতাপবাবুর ঘরে চলে গেলাম। বললাম, "আপনি পুলিশে ফোন করুন। আপনার ফ্যামিলির কোন স্ক্যান্ডাল হবে না। কিন্তু এ ঘটনা পুলিশকে জানাতেই হবে।"

উনি মাথা নাড়লেন। আমিও বেরিয়ে এলাম। বিনয়বাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুরুট টানছেন। আমায় আসতে দেখে বললেন, "কি গোয়েন্দাবাবু? আপনার পাশেই তো একটা লোক প্রায় মরতে চলেছিল।"

সেটা শুনতে পাইনি এমন ভাবে বললাম, "আমার একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল।"

"বল"

"আপনার স্ত্রী আর মেয়ে কি বাইরের জল খায় না? ওরা দেখলাম প্রত্যেকদিন মিনারেল ওয়াটারের বোতল নিয়ে আসে খাওয়ার সময়। রোহিত রোজ গিয়ে কিনে আনে।"

"নাহ। ওটা ওদের বাতিক। মাস সাতেক আগে একবার দুজনেই খুব অসুস্থ হয়েছিল। দিল্লীতে সেবার খুব গরম। ফ্রিজের জল ছাড়া খাওয়াই জায় না। একটা বোতলে মনে হয় কিছু পড়েছিল। সেটা খেয়েই দুজনের সাংঘাতিক অবস্থা। ভাগ্য পাশের ফ্ল্যাটেই ডঃ রয় থাকেন। তিনি ঝট করে কিছু ইঞ্জেকশান দিয়ে দুজনকেই নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেন। দু সপ্তাহ ছিল প্রায়।"

কথা বলে উনি চুরুটে শেষ টান দিয়ে সেটা ফেলে দিলেন। তারপর খাপ খুলে আরেকটা বের করলেন। খাপটার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মনে হচ্ছিল। চেয়ে নিয়ে সেটা খুলতেই দেখলাম ভেতরে আর দুটো রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে একটা হচ্ছে আগের যেটা খাচ্ছিলেন তার মতই। কিন্তু অন্যটা সামান্য ছোট। সেটা বের করতেই বিনয়বাবু অবাক হয়ে তাকালেন। এটার চেহারায় সামান্য তফাত রয়েছে। আমি এবার সেটা শুঁকতেই একটা অন্যরকম গন্ধ পেলাম। বিনয়বাবু কিন্তু সেটা শুঁকেই আঁতকে উঠলেন।

"সর্বনাশ। এতো খুব কড়া জিনিস হে।"

"হ্যাঁ ওটা দিন", বলে পার্স থেকে একটা মিনি এভিডেন্স ব্যাগ বের করে তার মধ্যে সেটা রেখে পকেটে রাখলাম। তারপর বললাম, "এ ব্যাপারে আর কাউকে কিছু বলবেন না। কাউকে না। বুঝেছেন?"

যখন ওঁর খাপটা ফেরত দিচ্ছি তখন লক্ষ্য করলাম তাতে একদিকে একটা চেরা দাগ।

-১২-

ল্যাপটপ খুলে সব পয়েন্টগুলো পর পর সাজালাম। এত ধরনের ঘটনা যে সবগুলোকে এক সুতোয় বাঁধা কঠিন। তবে এখানে কিছু কিছু জিনিস যেমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেরকম কিছু জিনিস আরেকটা লিস্টে লিখলাম। তারপর ভাবছিলাম আকাশপাতাল। চুরির ধাঁচটা বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী চোরকে ধরা কঠিন নয়। কিন্তু এ কেসে সেটা এক নয়।

এই সময় হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল আর রঞ্জনদা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

"শীগগিরই এস। প্রজেশদা কেমন করছে।"

প্রজেশ এবাড়ির সবচেয়ে পুরনো কাজের লোক। বয়স অনেক।

নিচে নামতেই দেখলাম রোহিত দৌড়তে দৌড়তে রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নাঘরে ঢুকতেই দেখলাম বিনয়বাবু, চন্দ্রিলবাবু, বিষ্ণু সবাই মেঝের দিকে তাকিয়ে। এককোণে প্রতাপবাবু দাঁড়িয়ে চোখ মুছছেন।

মেঝের অনেকটা জায়গা দখল করে পড়ে রয়েছে প্রজেশ। এক হাতে একটা কফির কাপ। মুখের মধ্যে কিছুটা কফি লেগে রয়েছে এখনও। চোখ দুটো উলটে রয়েছে।

আমি সন্তর্পণে মাটিতে বসে জিজ্ঞেস করলাম, "পুলিশে ফোন করেছেন?"

"হ্যাঁ। এসে পড়বে এখনই", প্রতাপবাবু খুব চাপা কণ্ঠে বললেন। আমি ওনাকে দুপুরেই বলেছিলাম খবর দিতে।

একটু এদিক ওদিক দেখে বললাম, "কেউ কিচ্ছু ধরবেন না। পুলিশ আসুক।"

মেয়েদেরকে এ ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমি মোবাইলটা নিয়ে প্রণয়কে ফোন করলাম।

সেই আগরতলার জমজমাট ঘটনার পর ওঁর সাথে আর দেখা হয়নি। প্রণয় মানেই রহস্য, অ্যাডভেঞ্চার। ফোন ধরেই বলল, "ভাই, তোমার তো কোন খবর নেই দেখি।"

প্রণয় এখন আইবি তে আছে। গতবারের পর ও পুরষ্কার হিসেবে এই চাকরিটা পেয়েছে। তাই বললাম, "তুই এক কাজ কর। আমি বেঙ্গলে লোহাগড় বলে একটা জায়গায় রয়েছি। এখানে এক্ষুনি একটা খুন হয়েছে এখানের নামকরা সরকার পরিবারে। পুলিশ এলে আমার লাইসেন্স দেখতে চাইবে। তুই একটু দেখ তো।"

"ওকে", বলে ও কেটে দিল। এতদিনের বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে দিয়েছে। তাই সৌজন্য বিনিময়ের চেয়েও বেশী জরুরি হচ্ছে সময়টা নষ্ট না করা।

আমি এবার রান্নাঘরের বাকি লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে প্রতাপবাবুকে বললাম ওনার

স্টাডিতে গিয়ে বসতে। তারপর আমি, রঞ্জনদা, বিনয়বাবু আর চন্দ্রিলবাবু রান্নাঘরের দরজার ঠিক বাইরে চেয়ার নিয়ে বসলাম। এটা আমার বুদ্ধি, কারণ তাতে খুনি আর ওই ঘরে ঢুকতে চাইবে না। আর এই খুনটা সে করতে চায়নি। ওঁর লক্ষ্য ছিল অন্য। কফির কাপটা ছিল প্রতাপবাবুর।

রোহিতকে ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হল মেয়েদের সঙ্গে। সামান্য পরেই পুলিশ এলো। আমার কথা ওকে বলাই ছিল। প্রণয় সত্যিই বন্ধুর কাজ করেছে। অফিসার ইন চার্জ হচ্ছেন মিঃ দত্ত। কম-বয়সি। আমার সাথে আলাদা করে কিছু কথা বলল।

আমি বলেই দিলাম আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য। তার সাথে এটাও বললাম যে আমি চাই না এই পরিবারের বদনাম ঘটুক।

যাওয়ার আগে বললেন যে দু-সপ্তাহের আগে এর রিপোর্ট পাওয়া মুশকিল।

আমি তখন বললাম, "আমি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এর সমাধান করে দিচ্ছি। আপনাকে কালকে ফোন করব।"

রান্নাঘরটা সিল করে চলে গেল। কাজের লোকেরা সবাই চুপ। তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে সবাই ঘুমোতে গেল। কিন্তু আমি জানি আজ রাতে কারও ঘুম হবে না।

-১৩-

খুব ভোরবেলা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দরজায় আওয়াজের জন্য। সন্তর্পণে উঠে এক হাতে আমার সুইস নাইফটা নিলাম। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা খুললাম।

বাইরে শ্রেষ্ঠা দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে ঘুম থেকে হঠাৎ উঠে এসেছে। মুখে একটা ভয়ের ছাপ। সামান্য কাঁপছে।

"কি হল?"

ও এদিক ওদিক তাকিয়ে রইল। তারপর কাছে এসে খুব চাপা স্বরে বলল, "আমার ঘরে... লোক...অচেনা।"

কথাটা শুনেই আমার ঘুম উড়ে গেছে। নাইফটা হাতে নিয়েই নামতে থাকলাম সিঁড়ী দিয়ে। শব্দ না করে হাঁটাচলা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। ওদের ঘরের দরজাটা খুলতে দেখলাম, ভেতরটা একদম অন্ধকার।

দু সেকেন্ড নিথর দাঁড়িয়ে থেকে ঝট করে ঘরে ঢুকে দরজার পাশেই সুইচ-বোর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে সবগুলো সুইচ অন করে দিলাম। ঝট করে আলো জ্বলে উঠল। শ্রেষ্ঠাকে বললাম ঘরে ঢুকতে। তারপর ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

একপাশে চন্দ্রিলবাবু ঘুমচ্ছেন। শ্রেষ্ঠা আমার কানে ফিসফিস করে বলল, "বাবা ঘুমের ওষুধ খায়। ওঁর ঘুম সাতটার আগে ভাঙবে না।

এক ঝলকে দেখে নিলাম যে এখন সোয়া চারটে বাজে। কিন্তু অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না কাউকে। শ্রেষ্ঠা অবশ্য সমানে বলে যাচ্ছে সে কাউকে দেখেছিল। যখন আমি পুরো খানতল্লাশী করে দেখলাম কেউ নেই তখন একটু শান্ত হল।

ওঁর পাশে বসে বললাম," ঠিক কি হয়েছিল বল তো?"

বড় নিশ্বাস টেনে বলতে শুরু করল, "একটা আওয়াজে আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। একটু সময় তাও চোখ বুজে ছিলাম। তারপর আমার খাটের বাঁদিক থেকে সামান্য নড়াচড়া টের পেতেই ওদিকে তাকিয়েছিলাম। তখন কাউকে দেখতে পাইনি। কিন্তু আবার চোখ বন্ধ করতেই আবার শব্দ পেলাম। দেখলাম এবার যে দরজা দিয়ে কেও বেরিয়ে গেল।"

"তাকে চিনতে পেরেছিলে?"

"নাহ", মাথা নেড়ে বলল।

"দেখে কিছু মনে হল? মানে এবাড়ির কারও মত?"

ও এটা শুনে অদ্ভুত ভাবে তাকাল। পরক্ষনেই মাথা নেড়ে বলল, "নাহ সেরকম না। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তা ছাড়া ঘুম চোখে দেখা।"

ওঁর কাঁধে হাত রেখে বললাম, "ঠিক আছে। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না। আমি যাচ্ছি।"

ও হাতটা চেপে ধরে বলল, "কিন্তু কিন্তু, আবার যদি আসে?"

"আর আসবে না। আচ্ছা, কিছু মিসিং আছে কি?"

"না। সেরকম কিছু তো মনে হয় না।"

"ঠিক আছে। এখন ঘুমোও। আর কিছু হলে আমায় ফোন করবে। ওকে?"

এই সময় খেয়াল হল আমি ওঁর হাতটা এখনও ধরে আছি। সেটা ছেড়ে দিয়ে বললাম, "ঠিক হ্যায়। আমি আসছি।"

কিন্তু ঘরে ঢুকে আর ঘুম এলো না। আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম। সব ঘটনাই এক জায়গায় ফিরে আসছে।

এই সময় ক্রুকেড হাউসের দিকে নজর পড়ল। আর শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল।

এ উপন্যাস যে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ওখানেও বাড়ির পরিচারিকা কফি খেয়ে মারা গিয়েছিল। তাতে ছিল বিষ। সেই বিষ যদিও বাড়িতেই মজুত ছিল। একই সাথে সেখানে আরও কিছু ঘটনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই অনুযায়ী তো ...

আর ভাবতে পারলাম না। তার আগেই দুচোখ বুজে এলো ঘুমে।

যখন উঠলাম তখন অনেক বাজে। আমার খাবার বিছানার পাশেই ঢাকা দিয়ে রাখা।

সারাদিন কোন চিন্তা করলাম না। দুপুরে খাওয়ার সময় অনেকেই দেখলাম এলো না। আমি প্রতাপবাবু, শ্রেষ্ঠা ও রঞ্জনদা খেয়ে নিলাম। তারপর কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়ালাম এসে।

শ্রেষ্ঠা এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কালকের ঘটনার পর ওঁর ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এইটুকু আচরণ ছাড়া আর কোন রকম কিছু করেনি ও।

সামান্য দুএকটা কথা বলে আমি ওপরে চলে গেলাম। সারা দুপুর শুয়ে রইলাম। যখন বিকেল হবে তখন অভি ফোন করল। কথা তেমন বলতে পারলাম না।

আমি এতক্ষণে প্রায় সমাধান করে ফেলেছি। শুধু চাই প্রমাণ। আর সেই জন্যই একজনকে ফোন করলাম। বললাম আমার ঘরে আসতে। প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া যাবে। তারপরই এই গোলকধাঁধার সমাধান হবে।

-১৪-

ও যখন আমার ঘরে এলো তখন বাইরের রং ধুসর। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে বলল, "আসব?"

"এস", আমি খাটে আধশোয়া হয়ে চোখ বুজে ছিলাম। সেই অবস্থাতেই বাঁ হাতে ইঙ্গিত করে ওকে বললাম বসতে। চেয়ারের আওয়াজে বুঝলাম যে বসেছে।

মিনিট তিনেক কোন কথা নেই। শ্রেষ্ঠাও চুপ। অগত্যা শেষে ওই নিস্তব্ধতা ভাঙলাম, "কার কথা ভাবছ?"

আমার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে একটু হতাশ হল। তাই আবার বলল, "আমায় ডাকলে কেন?"

গলায় একটু বিষণ্ণতা। হয়তো ভেবেছিল অন্য কিছু। আমার এখনও চোখ বন্ধ। বললাম, "একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।"

"কর। "বলে আওয়াজটা আরও কাছে এলো। খুব হালকা একটা গন্ধ আসছে। সেটায় যেন অন্য এক মোহ রয়েছে। মৃদু কস্তূরী এবং জুঁই এই দুইয়েরই মোহ রয়েছে তাতে। চোখ খুলতেই হল।

চোখ খুলতেই ওর সাথে চোখাচোখি হল। বিছানাতেই এসে বসেছে। সাদা সালোয়ার কামিজ পরায়, ওকে দুধে আলতায় ভেজানো মনে হচ্ছে। কিন্তু তারই মধ্যে সেই তীক্ষ্ণ চোখ দুটো সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে। তাতে হাজারো প্রশ্ন।

"তোমার ডিওর গন্ধটা তো দারুণ। অন্যদিন তো এটা লাগাও না। কি ব্র্যান্ড?", শ্রেষ্ঠা বলল।

চমকে উঠেও মনে মনে হাসলাম। আমি যেটা ভাবছি, ও সেটাই চিন্তা করছে। মুখে অবশ্য তা না বলে, বললাম ডিওটার নাম। বলে বললাম, "এই কেসের নিষ্পত্তি প্রায় হয়ে এসেছে। কিন্তু

কোথাও যেন আটকে যাচ্ছি। সেটা আমার ধারনা তুমিই বলতে পারবে। তোমায় আমি কিছু প্রশ্ন করছি। একদম সত্যি গোপন করবে না। আর মাঝে কোন প্রশ্ন করবে না। বুঝেছ?"

ও মাথা ওপর নিচ করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু এগুলো তুমি অন্য কাউকেও তো বলতে পারতে। আমায় কেন?"

"তাহলে তুমি আমায় উত্তর দেবে না?"

"না না। সেটা কখন বললাম? আসলে তুমি হঠাৎ আমায় ডাকলে। আমি ভাবলাম ..."

ওকে শেষ করতে না দিয়ে আমি বললাম, "তুমি উত্তর দেবে?"

ও আমার দিকে অনেকটা ঝুঁকে এসে বলল, "দেব।"

খোলা চুলগুলো আমার মুখে ছড়িয়ে আছে। তারই মধ্যে ও আমার কপালে হাত দিয়ে আবার বলল, "তুমি আর কতদিন লাগাবে এই মামলায়?"

"আজকেই শেষ। একটু পরেই ইনস্পেকটর আসবে ওয়ারেন্ট নিয়ে। তার পরই আমি সমস্যার সমাধান করব বাইরের ঘরে। কাল সকালেই আমি চলে যাচ্ছি।"

এই কথাটা শুনে শ্রেষ্ঠা হঠাৎ কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। "তাহলে তুমি কালই চলে যাবে? আমাকে...মানে আমাদের...এই বাড়ি থেকে?"

গলাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে গেল। অথচ আমি... যাই হোক। মুখে বললাম, "এখনও তো রাতটা বাকি আছে। সেটা ভুলে গেলে নাকি?"

ও দেখলাম অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে দুএকবার চোখ পিটপিট করল। তারপর আবার এদিকে তাকাতেই বললাম, "সেই হাসিটা একবার হাসবে?"

চোখ দুটো আমার দিকে প্রায় পনের সেকেন্ড মত তাকিয়ে থাকল। তারপর সেই হাসিটা আবার দেখলাম। যেই হাসিতে ভর দিয়ে বন্ধ চোখেও ফুটে ওঠে রঙিন এক পৃথিবী। যেখানে শুধুই আছে শান্তি। সে এক ভালবাসার পৃথিবী। অপার্থিব।

হালকা ধাক্কায় আবার চেতনায় ফিরে এলাম। শ্রেষ্ঠা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টি খুব অর্থপূর্ণ। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি বললাম, " এবার তাহলে জিজ্ঞেস করি?"

"লেটস্ স্টার্ট!"

"মাস সাতেক আগে দিয়া ও তার মায়ের অসুস্থ হওয়ার ব্যাপারটা জান?"

"জানি। আমরা তো তখন ওই বাড়িতেই ছিলাম। পরদিন শুনলাম অদের ওই অবস্থা। আশ্চর্য এই যে বাবাও তো ফ্রিজের থেকে জল খেল।"

শুনেই আমি চমকে উঠলাম। তারপর ওঁর হাত দুটো ভালভাবে ঝাঁকিয়ে বললাম, "থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ্।"

ও থতমত খেয়ে গেল। আমি ততক্ষণে ফোন বের করে ইন্সপেক্টর দত্তকে ফোন করছি। ধরতেই বললাম, "আপনি এখনই এসে যান। আমি এই কেসের সমাধান করে ফেলেছি।"

শ্রেষ্ঠা অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। আমি ওঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম না। শেষে যখন বলল, "তুমি জান কে খুনি?", তখন মাথা নাড়তেই হল।

এরপর আসল কাজ। রঞ্জনদাকে ফোন করে বললাম বাইরের ঘরে সবাইকে নিয়ে জমায়েত হতে।

কিছু জিনিস গুছিয়ে নিলাম। শ্রেষ্ঠা এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমিও তাহলে নিচে গিয়ে অপেক্ষা করি?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে আমি বললাম, "না। এই সব জায়গায় তোমার আর দিয়ার না থাকাই ভাল।"

"মানে?", ও যে কথাটা ভাল ভাবে নেয়নি তা বোঝা যাচ্ছিল। অনেক্ষন লাগল ওকে সামাল দিতে। শেষমেশ যখন রাজি হল, তখন ওঁর চোখে জল।

বাইরে গাড়ির আওয়াজে বুঝলাম মিঃ দত্ত এসে গেছেন। আমিও নিচে নেমে এলাম। হলঘরেই ওনার সাথে দেখা। কিছু জিনিস ওনাকে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর বাইরের ঘরে ঢুকলাম।

সেখানে তখন সবাই তটস্থ হয়ে বসে আছে। বড় চেয়ারটায় প্রতাপবাবু। তার পাশে রোহিত। অন্যদিকে সোফাতে বিনয়বাবু ও মেঘনাদেবী। উল্টোদিকে চন্দ্রিলবাবু ও রঞ্জনদা। মিঃ দত্ত দেখলাম দরজার পাশে গিয়ে একটা সিঙ্গ্‌ল সোফাতে বসল। দুজন কনস্টেব্‌ল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। আর অন্যদিকে গৌরব উইলচেয়ারে বসে। আমি চাইছিলাম না গৌরব থাকুক কিন্তু প্রতাপবাবুই ওকে থাকতে বলেছেন।

ঠিক সাতটা যখন বাজল, আমি উঠে দাঁড়ালাম। এক গ্লাস জল খেয়ে একবার প্রতাপবাবুর দিকে তাকালাম। তারপর বলতে শুরু করলাম।

-১৫-

"প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি প্রতাপবাবুর কাছ থেকে। আপনি আমায় একটা কাজ করার জন্য কদিন থাকতে বলেছিলেন। সেটা করার সময় আমি আরও অনেক জিনিসে নাক গলিয়েছি। অনেক ঘটনাও ঘটেছে। এবং একজনের প্রাণও গেছে।

আমি শুরু করছি ৩ বছর আগে থেকে। গৌরবদা তার শ্রদ্ধেয় মা-বাবার সাথে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। তারপর কি হয় আপনাদের সবার

জানা। প্রতাপবাবু ওনাকে এ বাড়ীতে এনে রাখেন। নাতির ওপর তিনি এতটাই স্নেহ দেখান যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির প্রায় সবটাই ওঁর নামে করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি যখন থেকেই এই ঘটনাটা শুনি, সেদিন থেকেই মনে খটকা লেগেছিল।

যাই হোক, দুর্গাপুর গিয়ে ওই ঘটনার আমি কোন তদন্ত করিনি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছি। তারপর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। সেটা পরে বলব।

এর মধ্যে একটা খুব দুষ্প্রাপ্য জিনিস খোয়া গেছে। একটা আইভরির লাফিং বুদ্ধ। শখের হলেও সেটা ধার্মিক। আর অজস্র হিরে বসানো তাতে। দাম খুব কম হবে না।

প্রতাপবাবু আমায় বলেন এই বাড়ির কোন লোকই চোর। কথাটা আমি মেনে নিই এই কারণে যে এখানে বাইরের লোকের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ। কাজের লোকরাও সবাই পুরনো। অর্থাৎ এই পরিবারের কেও চুরিটা করেছে।

আমি প্রথমেই দেখি মোটিভ। কেন চুরি করবে? টাকার জন্য? কার এখানে অভাব? দেখলাম আপনাদের সবার ফিনান্সিয়াল প্রবলেম রয়েছে। আর যেহেতু প্রতাপবাবু উইল পালটাবেন না, তাই ওনাকে সরিয়ে লাভ নেই। বরং মূর্তিটা বেচে দিলে ভাল অ্যামাউন্ট আসবে। সেই ভেবে আমি রঞ্জনদাকে বাদ দিই। কারণ উনি বেশ তোয়াজেই আছেন। বাকি রইল দুই ভাই। এবং আপনার পুত্রবধূ।"

বলে একটু দম নিলাম। চন্দ্রিলবাবু আর রঞ্জনদা যেন গল্প শুনছে এমন ভাবে তাকিয়ে। মেঘনাদেবীর ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি।

উপেক্ষা করে আবার শুরু করলাম, " তাই আমি অপেক্ষায় ছিলাম যে চোর এর পরে কি করে? ইন্টারনেটে দেখলাম ওই মূর্তিটার খোঁজে কিছু বিজ্ঞাপন রয়েছে। কিন্তু সেই মেল অ্যাড্রেসে খোজ করে দেখলাম তারা এখনও মূর্তিটা পাননি। তখন আমি ওদের মধ্যে একজনকে ফোন করি। জানতে পারি যে ওই মূর্তিটা অ্যান্টিক। তাঁর এই কারণ যে ওটা দলাই লামার সাথে এসেছিল।

কিন্তু এখনও মূর্তিটা পাওয়া যায়নি। তাঁর মানে চোর ওটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কোথায়?

এর মধ্যে গতকাল সকালে আমি একটা হুমকি চিঠি পাই। তাতে লেখা ছিল, "ওহে গোয়েন্দা, এই বাড়িতে নাক না গলিয়ে নিজের চরকায় তেল দাও"। সেটা পড়ে আমি বুঝতে পারি যে চোর খানিকটা ঘাবড়ে গেছে।

যাই হোক আজ ভোরবেলা, শ্রেষ্ঠা ও চন্দ্রিলবাবুর ঘরে একজন লোক ঢোকে। শ্রেষ্ঠা আমায় ডেকে আনে কারণ চন্দ্রিলবাবু ঘুমের ওষুধ খান। তখনই আমি বুঝতে পারি যে ওই ঘরেই মূর্তিটা লুকনো রয়েছে। তাড়াহুড়োয়

চোর একটা জিনিস ফেলে যায়। সেটা আমি কুড়িয়ে নিই। তারপর, এটা বুঝে যাই যে মূর্তিটা পেতে চোর মরিয়া কারণ সে এবাড়ি থেকে পালানোর তাল করছে।

তাঁর মানে সে খুনের ঘটনায় ভয় পেয়েছে। এবং এটাও তাহলে ঠিক যে সে খুনি নয়। তবে? তাই আমি সারাদিন ঘরে বসে চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই। চোর তবে পুরুষ নয়। কারণ সে নিজের হাতের আংটি ফেলে গেছিল ওই ঘরে আজ ভোরে। তাহলে? আর সে যে মহিলা তাঁর আরও প্রমাণ রয়েছে। মূর্তিটা রয়েছে শ্রেষ্ঠার মেকআপ বক্সের মধ্যে। কোন পুরুষ সেখানে রাখবে না।"

এই বলে আমি মিঃ দত্তর দিকে তাকালাম। উনি ইশারা করতেই একজন মহিলা পুলিশ এসে একটা বাক্স ওনার হাতে দিলেন। সেটা খুলতেই দেখা গেল তাঁর মধ্যে লাফিং বুদ্ধ রয়েছে।

ঘরের সবাই অবাক। শুধু মেঘনাদেবী হাসছেন। বললেন, "বাহ। এতো উপন্যাসকেও হার মানায়। আমায় ভিলেন বানাচ্ছ?"

"তাহলে আপনার আংটি ওই ঘরে গেল কি করে?"

"কোন প্রমাণ আছে তুমি আংটিটা ওই ঘরেই পেয়েছ?"

"এই মেক আপ বক্সে কিন্তু আপনার হাতের ছাপ আছে। তাড়াহুড়োয় সেটা মুছতে পারেননি।"

"অসম্ভব। আমি ওটা ধরব কেন?"

"কেন ধরবেন না?"

"ওটা আমি ধরিইনি। আমি মূর্তিটা একটা জুতোর খালি বাক্সয় রেখে..."

মেঘনাদেবী হঠাৎ বিষম খেলেন। তারপরই অপ্রস্তুত হয়ে তাকালেন প্রতাপবাবুর দিকে। তিনি ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন। বিনয়বাবু রেগে লাল। আমার দিকে ফিরে বললেন, "তোমার এত বড় আস্পর্ধা। আমার ওয়াইফের ওপর অ্যালিগেশান আনছ? জান আমি ..."

"আপনি চুপ করুন। আপনার জানা নেই অনেক কিছুই। এর পরেও যদি কিছু করেন তখন আপনাকেও কিন্তু ওনার পার্টনার ইন ক্রাইম বলে আইডেন্টিফাই করা হবে।"

এই কথা শুনে উনি চুপসে গেলেন। মেঘনাদেবী কাঁদছেন। অবাক হয়ে দেখলাম, রোহিত জায়গা ছেড়ে নড়লই না। শুধু একটাই কথা বলল।

"মা! তুমি!"

"উনি মূর্তিটা একটা জুতোর বাক্সয় রেখেছিলেন। মেকআপ বক্সে রাখলে সেটা শ্রেষ্ঠা দেখে ফেলবে সহজেই। কখন কিভাবে চুরিটা হল তা উনি আশা করি নিজেই বলবেন। আপনারা, আমি যেদিন এলাম তাঁর আগেরদিন

বলছিলেন না, প্রতাপবাবুকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি? সেটা এই কারণে যে উনি চলে গেলে আপনারা কিছুই পাবেন না। আপনার বুটীক তো অনেকদিন হল বন্ধ মিসেস সরকার। তাই এখানে আসার আগে ওনাকে হুমকি চিঠি পাঠালেন। যখন দেখলেন আমি সহজে হাল ছাড়ব না তখন ভাবলেন হুমকি দিলে ভয় পাব।"

সেই মহিলাপুলিশ এসে ওনাকে নিয়ে গেল। বিনয়বাবু কি করবেন বুজতে পারছেন না। ওনার কাছ থেকে আমি চুরুটের খাপটা চাইলাম।

সেটা মিঃ দত্তকে দিয়ে আবার একটু জল খেয়ে নিলাম। তারপর বলতে শুরু করলাম আবার।

"এতো গেল চুরির ঘটনা। কিন্তু এছাড়াও এখানে আরও অনেক কিছু হচ্ছে। আমি সেটা নিয়েই এবার বলব।

"প্রতাপবাবুর বড় ছেলে অর্থাৎ গৌতম সরকার এবং ওঁর স্ত্রী অপর্ণা সরকার তিন বছর আগে মারা যান। আমি নেটে সেই রিপোর্ট পড়তে পড়তে এক জায়গায় দেখি লেখা আছে। যে গাড়িটা পড়ে যখন চেক করা হয় তখন দেখা যায় যে ওতে মেন ট্যাঙ্কে তেল প্রায় ছিলই না। আর রিজার্ভে ছিল ভুয়ো তেল। সামান্য এদিক ওদিক হলেই অ্যাকসিডেন্ট। সরকার পরিবারের খাতিরে এটা আর ওদের বলা হয়নি।

এর পরের ঘটনা আজ থেকে সাত মাস আগের। মেঘনাদেবী এবং দিয়া দুজনেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারণ ওদের ফ্রিজে একটি মাত্র বোতলে সেই বিষাক্ত জল ছিল। পড়শি ডঃ রয়ের সৌজন্যে ওনারা বেঁচে যান। এটাও আমার কাছে খুব আশ্চর্যজনক লাগে। তাহলে নিশ্চয়ই কেও ওই দুই বোতলে বিষ মিশিয়েছিল। বিনয়বাবু বা রোহিত না কারণ তাহলে ওরা এই সাত মাসে আরও অনেকবার মারার চেষ্টা করত। তাহলে এমন কেও, যে ওই সময় ওদের বাড়ি গিয়েছিল। এবং ফ্রিজ থেকে বোতল বের করলেও কেও সন্দেহ করবে না।

এবার আরও রিসেন্ট ঘটনা। আমি যেদিন এলাম তার পরেরদিন গৌরবদা সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়। আমি লক্ষ্য করি যে ওঁর উইলচেয়ারটার সাথে কেও ট্যাম্পার করেছে। তাঁর পরদিন দেখি ওঁর যেই ওষুধ খাওয়ার কথা ছিল তা পালটে অন্য ওষুধ রাখা। আমার সাধারণ ড্রাগ সেন্স বলে যে ওই ওষুধ খেলে ও দুই সপ্তাহেই প্যারালাইজ হয়ে যাবে। তখন সেটাকে বলা হবে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার ফল। অর্থাৎ এটাও একটা খুনের চেষ্টা।

পরদিন চন্দ্রিলবাবুর খাওয়ায় বিষ পাওয়া যায়। এখানে আমার একটা খটকা লাগে। তবে আমি সেটা উপেক্ষা করি। কিন্তু যখন প্রজেশ মারা গেল তখন আমি আবার নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করলাম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যে প্রতাপবাবুকে মারার জন্য কফিটা বানানো হয়েছিল। কিন্তু না। ওনাকে মেরে কার লাভ? গৌরব এবং রোহিত? রোহিত ওইটুকুর জন্য

এত কিছু করবে না। তাহলে? অন্য কেও? প্রচণ্ড আক্রোশে মেরে ফেলতে চায়? অর সামথিং এলস্?

আমি তাই মিঃ দত্তকে বলি এই বডিটা একজন ডক্টরকে দিয়ে বেসিক টেস্ট করাতে। উনি রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন। তাতে লেখা রয়েছে 'প্রাইমারি কজ অফ ডেথ ডিউ টু স্ট্র্যাঙ্গুলেশান'। দ্যাট মিন্স, ওকে প্রথমেই খুন করে তাঁর পর মুখে কফি ঢেলে দেওয়া হয়।

কিন্তু কেন? এখানে বিনয়বাবুর চুরুটের বাক্স দেখে আমার আবার সন্দেহ জাগে। ওঁর বাক্সতে একটা চুরুট অন্যরকম ছিল। সেটা আমি গ্রিন টেস্ট করতেই দেখা গেল, তাতে হেভি ডোজের সেরাম রয়েছে। অর্থাৎ আরেকটা খুনের চেষ্টা।

ততক্ষণে আমি ঠিক করে নিয়েছি যে খুনি সব কাজ একাই করছে। তাহলে সে প্রজেশকে মারল কেন? নিশ্চয়ই তাকে কোন অকাজ করার সময় প্রজেশ দেখেছিল।

তাহলে সে কে ? সেই একই লোক যে ৩ বছর আগে রিজার্ভে ভুয়ো তেল রেখেছিল। যে গাড়ীর মেকানিস্‌ম সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে। যে মাস সাতেক আগে বিনয়বাবুদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। দিল্লীতে যাওয়ার অজুহাতে অদের ফ্ল্যাটে গিয়ে ফ্রিজ খুলে জল খেয়েছিল। সেই ফাকেই ওঁর মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। সেই লোকই গৌরবের উইলচেয়ার অকেজো করেছে। সেই লোক তাঁর ওষুধ পালটে দিয়েছিল। চুরুট পালটে দিয়েছিল। এবং প্রজেশকে খুন করেছে। ও হ্যাঁ। সন্দেহ না হওয়ার জন্য নিজের ডালের বাটিতে বিষের ট্যাবলেট ফেলে দেয়। তখন আমার খটকা লেগেছিল কারণ উনি সেদিন ডাল খাওয়ার আগে আরও দুটো আইটেম খেয়েছিলেন, যেটা সাধারণত করেন না। আমি সবার খাওয়া লক্ষ্য করেছি। আসলে আমি পাশে বসে ছিলাম বলে আপনি ট্যাবলেট দুটো ফেলতে পারছিলেন না। কি চন্দ্রিলবাবু? ঠিক বললাম?"

আমার কথা শূনে চন্দ্রিলবাবু কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বিদ্যুৎবেগে উঠে গিয়ে গৌরবের ঘাড়ে একটা হাত রাখলেন। তাতে একটা ছুঁড়ি।

"এক পাও কেউ আসবে না। আমি মেরে ফেলব। সরে যান ইনস্পেক্টর। নইলে ও বাঁচবে না।"

এক পা এক পা করে পেছাচ্ছেন চন্দ্রিলবাবু। গৌরব সামনে আছে দেখে মিঃ দত্ত কিছু করতেও পারছেন না। ওনার হাতের উদ্যত রিভলভার নামিয়ে নিলেন।

ঠিক এই সময় পেছন থেকে শ্রেষ্ঠা ডেকে উঠল, "বাবা!"

চমকে গিয়ে পেছনে তাকাতেই মিঃ দত্ত ওনার হাত মুচড়ে ছুড়িটা নিয়ে নিলেন। অন্য

কনস্টেবল দুজন চন্দ্রিলবাবুকে ধরে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

আমি ততক্ষণে গৌরবকে ধরে ফেলেছি। ও টলে পড়ছিল। আমি আর রোহিত মিলে ওকে ঘরে শুইয়ে দিলাম।

শ্রেষ্ঠা কাঁদছিল। দিয়া আর প্রতাপবাবু ওকে দুদিক থেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আমি মিঃ দত্তর সাথে কথা বলে আবার এই ঘরে ঢুকলাম। রঞ্জনদা উঠে এসে আমার কাঁধে হাত রাখল।

বিনয়বাবুও এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। আমি বললাম, "আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু সত্যিটা আমায় বের করতেই হত।"

উনি মাথা নেড়ে বললেন, "দ্যাখো ভাই। তোমার কাজটা তুমি করেছ। কিন্তু ওরা নিজের কাজ না করে ... অ্যাঁ? দিয়ার জন্মের সময় যে আমার কি অবস্থা ছিল তুমি জান না। তখন ওঁর মা হাসপাতালে। আমি করিনি এমন কাজ নেই। রোহিতের পড়াশোনা থেকে দিয়ার সব খরচা একা টেনেছি। অথচ ওকে দ্যাখ। টাকার স্বপ্নে কি করে বসল। আর চাঁদু? অ্যাঁ? পরিবারের বড় ছেলেটাকে অনাথ করে দিল। নিজের দাদা বউদিকে মেরেছে, সবাইকেই মেরে ফেলত।"

রঞ্জনদা চুপচাপ মাথা নেড়ে গেল। প্রতাপবাবু এসে নিজের মেজ ছেলেকে দেখলেন। কি আর বলবেন? এই অভিশপ্ত রাতে যে নিশব্দই অনেক কথা বলে যাচ্ছে।

শ্রেষ্ঠার পাশে গিয়ে বসলাম। ও আমায় দেখেও কান্না থামাল না। দু মিনিট বসে তারপর দিয়াকে ইশারা করাতে ও শ্রেষ্ঠাকে নিয়ে চলে গেল। ঘর থেকে বেরোবার আগে একবার চোখাচোখি হল।

মূর্তিটা একবার দেখে নিয়ে আমি প্রতাপবাবুকে বললাম, "এই নিন। এই যে ডিটেলস্ আছে। রঞ্জনদা কন্ট্যাক্ট করে নেবে।"

-১৬-

পরেরদিন সকালে উঠে বাগানে ঘুরলাম কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে এসে গোছগাছ করছি যখন তখন দেখলাম আমার বালিশের পাশে একটা প্যাকেট। খুলতে ভেতর থেকে একটা চেনা গন্ধ পেলাম।

শ্রেষ্ঠার গলায় পরা লকেট। ওর সেই মোহময়ি গন্ধে ভরা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম সেভাবেই। দরজায় টোকা পরতে হাতটা মুঠো করে নিলাম।

শ্রেষ্ঠা ঘরে ঢুকল। অন্য হাতে দরজাটা বন্ধ করে বলল, "রঞ্জনদা বলল তোমার গাড়ী রেডি। কখন বেরোবে?"

"এই তো।", বলে বাকি জিনিস গুছিয়ে নিলাম। ও খাটে বসে এক দৃষ্টিতে আমায় দেখছিল। এবার বলল, "চলে যাওয়ার আগে এখানে কোন কাজ নেই আর?"

আড় চোখে তাকিয়ে দেখালাম, ওঁর দু চোখ ভয়ানক লাল। কাল সারারাত কেঁদেছে, বোঝাই

যায়। বললাম, "হ্যাঁ। এটা যথাস্থানে ফেরত দিতে হবে।"

মুঠো খুলে লকেটটা বের করেছি। সেটা ওঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললাম, "এটা তোমার জিনিস। তোমার কাছেই থাক।"

বলে ও আবার ফুঁপিয়ে ওঠার আগেই আমি আমার ল্যাপটপের ব্যাগটা পিঠে নিয়ে, অন্য ব্যাগটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

গাড়িতে ওঠার আগে, রঞ্জনদা এসে আমার হাতে একটা খাম দিয়ে গেল। সেটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে ড্রাইভার আমার ব্যাগ ডিকিতে তুলে দিল। এখান থেকে বোলপুর গিয়ে ট্রেনে কলকাতা। কালকেই আবার ফ্লাইট ধরতে হবে। সকালে প্রণয়ের মেল পেয়েছি।

রঞ্জনদা আসতে পারবে না। আমিও না করলাম। তার পর গাড়িতে ওঠার আগে একবার ওপরে তাকালাম।

গাড়ি যখন লোহাগড় ছাড়াচ্ছে তখন খাম থেকে চেকটা বের করলাম। আর তখনই একটা মেসেজ এলো ওয়াটস্অ্যাপে। চশমার ভেতর দিয়েও নামটা চোখে আটকে থাকবে।

শ্রেষ্ঠা।।

পিকলু
জুরান নাথ
বাবা! এই অঙ্কগুলো কিছুতেই পারি না! হেল্প করবে ?
খবরদার পিকলু! পারব না কথাটা আর বলবে না! মানুষ চেষ্টা করলে সবই পারে! যাও, আবার চেষ্টা কর।
এবং -
স্নান করব, অথচ সাবানটা কোথাও পাচ্ছি না! পিকলু! এই পিকলু ———
সাবান পেয়েছ বাবা !
তোমাকে অঙ্ক করতে বললাম! তুমি এখানে বসে সাবান দিয়ে বুদ- দ ওড়াচ্ছ পিকলু ই - র - র - ক ! বাবারে ! গেছি !
কি-কিন্তু অঙ্কগুলো পারছিনা যে বাবা !
আবার বলছ পারছিনা ! বলেছিনা যে, চেষ্টা করলে সবই হয়।
আরে ! ও কিসের শব্দ !
এ কি !!
কি হচ্ছে !
আমি অঙ্ক পারছিলাম না। বাবা বলল চেষ্টা করলে মানুষ সবই পারে। তাই বাবাকে বলেছি বুদ-বু দেওয়ালে গাঁথতে। বাবা চেষ্টা চালাচ্ছে !
হিক !!
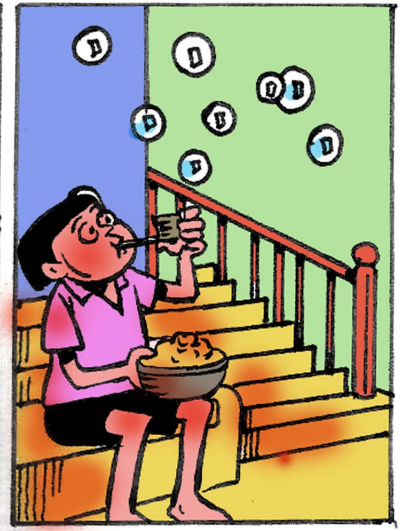
শরৎ মানেই খুশী

বাণী চক্রবর্তী

শরৎ মানে নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা,
শরৎ মানে কাশের বনে কাশফুলেরই দোলা।

শরৎ মানে খুশীর হাওয়া, শিউলি ফোটা ভোর,
শরৎ মানে বীরেনবাবুর চণ্ডীপাঠের সুর।

মহালয়ার ভোরের বেলায় যেমন খুশী ঘোরা,
শরৎ মানে প্রবাসীদের ঘরে ফেরার তাড়া।

নতুন নতুন জামাজুতো কেনার তড়িঘড়ি,
শরৎ মানেই পুজোর সংখ্যা, নতুন গানের কলি।

পুজোর ছুটির আনন্দেতে সবাই নিমগন্,
শরৎ মানেই শঙ্খ ঘন্টা কাঁসরেতে মায়ের আরাধন।

প্রিয় ঋতু শরৎ তোমায় করি আবাহন,
এসো এসো শরৎ তুমি ভুবনমোহন।
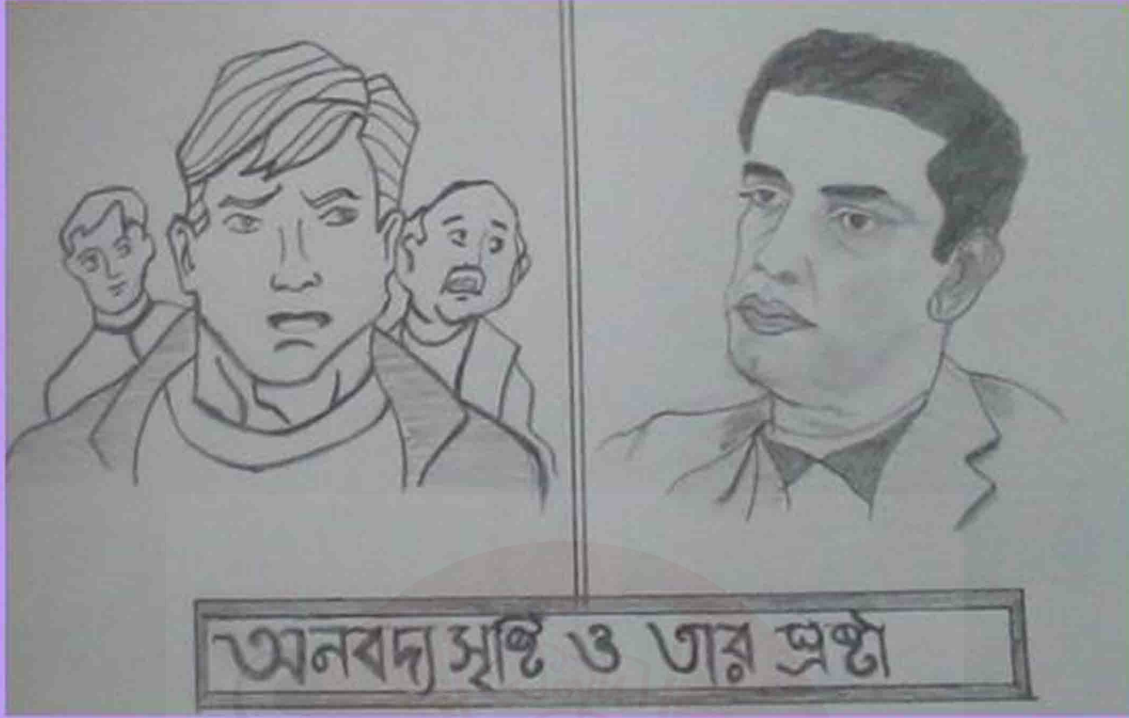
সৃষ্টি ও তার স্রষ্টা - দীপান্বীতা ভট্টাচার্য্য

সুকুমার রায় - আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলুদাকে চিঠি

দীপান্বিতা ভট্টাচার্য্য

ফেলুদাকে,

আমাদের সকলের প্রিয় তুমি সেই ফেলুদা

তোমার রহস্য সমাধানের পদ্ধতি একেবারে আলাদা।

শুধু মগজাস্ত্রের উপর করে নির্ভর,

কত শয়তানের কাজে এনে দিয়েছ উপসংহার।

লখ্নৌ, মুম্বাই, কলকাতা – নয় শুধু দেশে,

সত্য উদঘাটনের তাগিদে বিদেশে পাড়ি দিয়েছ অনায়াসে।

তোপসে আর জটায়ুর নিয়ে সঙ্গ,

মগনলাল, ভবানন্দের খেলা করেছ ভঙ্গ।

তোমার মত শিক্ষক শুধু তোপসে নয়, আমরাও পাইনি কোনদিনও,

জানি সিধুজ্যাঠা আজও তোমার কাছে Google-এর চেয়ে প্রিয়।

যদিও তোমার খবর আমরা পাইনি বহুদিন,

তবু নির্দ্বিধায় বলতে পারি তুমি আজও সত্য সন্ধানে আছ লীন।

আজ সত্যকে ঢেকে দেওয়া হয় মিথ্যার আড়ালে,

সেই অভিমানে কি তুমি আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে?

তোমাদের থ্রি মাস্কেটিয়ারসকে দেখতে খুব ইচ্ছা হয়,

মনে হয় হঠাৎ যদি রজনী সেন রোডে তোমাদের দেখা পাওয়া যায়!

জটায়ুর সেই সবুজ অ্যাম্বাসাডারে নিয়ে ত্রিমূর্তিকে,

হরিপদবাবু ছুটে চলেছেন শহরের এদিক থেকে ওদিকে।

এতো গেল আশার কথা, বাস্তবে তোমার দেখা নাই,

আজকের পরিস্থিতি সামাল দিতে ফেলুদা তোমায় চাই–ই চাই।

মগনলাল আর ভবানন্দে ভরে গেছে দেশখানা,

তুমি এসে এদের বিরুদ্ধে জারি করো পরোয়ানা।

অভিমানের পাহাড় ভেঙ্গে নামো তুমি ময়দানে,

দেখবে কত মানুষ সাড়া দেবে তোমারই আহবানে।

এই চিঠি পড়ে তুমি যদি একবারও প্রকাশ্যে আসার কথা ভাব,

বুঝব আমাদের প্রয়াস সার্থক, তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রব।।

ইতি,

তোমার ভক্তগণ।

গল্প

ডোর বেলটা বাজাতেই ইপ্সিতা এসে দরজা খুলে দিয়ে ভেতরের সোফায় গিয়ে বসলো। আমি সোফায় বসে যখন ঘড়ির দিকে তাকালাম ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে দশ মিনিট, অর্থাৎ আমি দশ মিনিট লেট। যদিও প্রোফেসর দত্ত এখনো পড়ানো শুরু করেননি। সোম, বুধ ও শনিবার আমরা প্রফেসর দত্তর বাড়িতে পড়তে আসি। আমরা বলতে আমি, ইপ্সিতা, সপ্তদীপ ও অভিক এই চারজন। এই পাড়াতেই আমরা থাকি। সপ্তাহে তিন দিন প্রোফেসর দত্ত আমাদের পড়া দেখিয়ে দেন। প্রোফেসর দত্ত হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্য বিভাগের একজন নামকরা প্রোফেসর। উনি সাধারণত কলেজ ছাড়া নিজের নানান শখ নিয়ে সময় কাটাতে পছন্দ করেন, আলাদা করে ছাত্র পড়ান না। আমরা যেহেতু পাড়ার ছেলে মেয়ে তাই আমাদের একটু নিস্বার্থে পড়া দেখিয়ে সাহায্য করেন। আমি বসার সাত মিনিট এর মধ্যেই প্রোফেসর দত্ত পড়ানো শুরু করতে যাচ্ছে এমন সময় আমার চোখ বসার ঘরের দেয়ালে টাঙানো বাঘের চামড়ার দিকে যায়। এবং সেটা দেখেই আমি প্রোফেসর দত্তকে একটা প্রশ্ন করে ফেলি।

“আচ্ছা স্যার আপনি এই জিনিসটা কোথা থেকে পেয়েছিলেন ?”

“শুনবি সেকথা ? সেকথা যদি শুনতে চাস তালে তোদের আজকের পড়া লাটে উঠে যাবে, থাক গে...”

"স্যার স্যার পড়া তো আমরা অনেকটা এগিয়ে আছি। আপনি এই বাঘের চামড়া পাওয়ার কথাটা শোনান না। “বলল ইপ্সিতা।

"ঠিক আছে শোনাচ্ছি, তবে তার আগে হাবলুকে এককাপ কফি আনতে বল" হাবলু হলো প্রোফেসর দত্তের কাজের লোক। আমি উঠে গিয়ে কফির কথা বলে এলাম। এসে ভালো করে বাঘের চামড়াটা

দেখছিলাম, দেখতে দেখতেই হাবলু কফি নিয়ে এলো, প্রোফেসর দত্ত কফিতে একটা লম্বা চুমুক লাগিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা শুরু করলেন।

"তখন আমার বয়স আর কত। তোদেরই মত সতেরো-আঠারো, সেইসময় আমার মাথায় ছিলো জঙ্গল ঘুরে বেড়াব, শিকার কি করে করে দেখব, নিজেও শিকার করব, এসব মাথায় ঘুরছে। জঙ্গল, পাখি, পশু নিয়ে নানান বই পড়ছি। সেই সময় কলকাতায় আমার বড়মামা শঙ্কর আচার্য এলেন তিনি যে মস্ত বড় শিকারী সেটা আগেই মায়ের কাছে শুনেছি৷ আসতেই মা আমার কথা ওনাকে বলেন৷ উনি সে শুনে খুব খুশি হয়ে বলেন "এইতো ভাগ্নে মামার মত হয়েছে"।

আমি তখন ওনাকে বললাম "মামা কয়েকদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো যাবে তোমার সাথে?"

"যাবি মানে নিশ্চয় যাবি৷ সুন্দরবনে এমন কোনও লোক নেই যে আমায় চেনে না আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বড় বাবু আমার ছোট বেলার বন্ধু, দাঁড়া এইবার আমি তিন দিন তোদের বাড়িতে আছি তোর বাবার সাথে কথা বলে এক সপ্তাহের জন্য তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।"

মামা এখানে থাকা কালীন একদিন লালবাজারের একটি বন্দুকের দোকানে গিয়ে গুলি কিনে আনলেন এবং কথা মত বাবাকে বলে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

আমরা শিয়ালদা থেকে ক্যানিং লোকাল ধরে ক্যানিং-এ নামি। সেখান থেকে তিন খানা ছোট ছোট নদী পেরিয়ে ও আরো কিছুটা হেঁটে গোসাবাতে মামার বাংলোতে পৌছই। চারিধারে গ্রাম্য মাটির বাড়ির পেছনে একটা বড় সাদা রঙের অট্টালিকা। সেটাই মামার বাড়ি। সেখানে পৌঁছে সময় দেখি বেলা এগারোটা। কথা হয় আজ বিশ্রাম নিয়ে কাল ভোর বেলা আমরা নৌকা নিয়ে বেরোব। আরো অনেকে যাবে আমাদের সঙ্গে তাদের মামা খবর পাঠিয়ে দেবে।

পরের দিন ভোর বেলা মামা ও আমি বেড়ালাম। সঙ্গে মামার বন্দুক ও একটি বড়ো ছোরা। অনেকটা কাদা মাটি পথ হেঁটে আমরা নদীর ঘাটে পৌছালাম সেখানে একটি বড়ো নৌকা নিয়ে সুরেশ ও পরেশ দুই ভাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের হাতেও লাঠি সোটা ছিলো, তারা নিয়মিত জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়৷ আমরা সবাই নৌকায় বসলাম ও মকবুল নামের মাঝি নৌকা চালানো শুরু করলো। দুধারে ঘন সবুজ, তার পাড় কাদা মাটিতে ভর্তি। কিছুটা এগিয়ে নৌকা একটা শক্ত পাড়ের দিকে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখান থেকে মামার এক শিকারী বন্ধু নারায়ন রায়চৌধুরী বন্দুক নিয়ে উঠলো সঙ্গে তার ছেলে অমলেশ এবং আরও এক লাঠিবাজ লোক৷ তাদের হাতে এক বস্তা মাল, পরে জানা গেল তাতে চাল, ডাল, মশলাপাতি আছে বনে নাকি আমরা রান্না করে খাব৷ সেটা শুনে আমার মন আরও খুশিতে ভরে উঠলো।

বৃষ্টির সময় তাই নদী ফুলে ফেঁপে রয়েছে, মামা তার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বন্ধুকে বলে জঙ্গলে পিকনিকের আদেশ নিয়ে নিয়েছে। কিছুদূর এগোতেই চোখের সামনের দৃশ্য বদলাতে শুরু করে চারি ধারে জল, জঙ্গল এখানে আরও গভীর, জোয়ারের সময় নাকি জল বেড়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়, পাড়গুলো কাদাময় এবং সব গাছের মূল কাদার ওপর দিয়ে বেরিয়ে আছে। গাছে কত পাখি সুন্দর ভাবে ডেকে যাচ্ছে. গাছে গাছে ছোট বাঁদরও দেখা যাচ্ছে। এই সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ভালো হয় যায়৷ মন ভরে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখছি হথাৎ মাঝি চেঁচাচ্ছে "কুমির..

কুমির.." আমি উৎসাহে নৌকার ধারে গিয়ে বসলাম। দেখি সত্যি দুটো কুমির আমাদের নৌকার দিকে এগিয়ে আসছে।

নারায়ন বাবু বলে উঠলেন "দি ব্যাটাকে সাবরে ?" বলে উনি বন্দুক উঠিয়ে তাদের দিকে তাগ করে।

মামা বলল "আর একটু আসতে দাও ওর দৌড়টা দেখি, ব্যাটা মানুষ খাওয়ার লোভে, জানিস ভাগ্নে এই কুমিরগুলো নৌকার ধারে আসে ও এসে লেজ দিয়ে জলে জোরে ঝাপটা মেরে নৌকা উল্টাবার চেষ্টা করে আর নৌকা যদি ওল্টায় তাহলে এক জনকে টেনে নিয়ে চলে যায়.. ।"

নারায়ণ বাবু কোনো কথা বললেন না। বন্দুক উঠিয়ে দাড়িয়ে আছেন । কুমিরের কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই সে নৌকার দিকে আসতে লাগলো । কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা অনেকটা এগিয়ে আসে । আমাদের অন্য দিকে তাকাবার কোনো চেষ্টা নেই । সেই কুমির দুটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি৷ বনের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দুটি বিকট আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের গাছগুলো থেকে পাখিগুলো চেঁচামেচি করতে করতে উড়ে গেল। একটি কুমির জল থেকে দুই ফুট উঁচুতে উঠে জলের মধ্যে আবার পড়ল৷ এত জোরে এইটা হলো যে নৌকাটা হেলে উঠলো ও আমাদের সবার গায়ে জলের ছিটে এলো । দ্বিতীয় কুমিরটাকে আর দেখা গেলনা। জলের ওপরে লাল রক্ত ভরে গেল৷ মামা মাঝি কে এগিয়ে যেতে বলল। যতক্ষণ দেখা যায় আমি সেদিকেই তাকিয়ে রইলাম। নৌকো এগিয়ে যেতে লাগলো।

যত এগোচ্ছি জঙ্গল আরো গভীর হচ্ছে । জঙ্গলের ভেতরটা শিবের মাথার জটার মত ঘিঞ্জি । অনেকটা এগোতে একটা অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা দেখে মামা বলে উঠলো "কি নারায়ন, এই জায়গাটা তো কুমিরের থেকে নিরাপদ মনে হচ্ছে, এখানেই পিকনিক করা যাক নাকি ?"

"হ্যাঁ এইটা ভালো জায়গা, আগে একবার এখানে এসেছি ভালো জায়গা" নারায়ণ বাবু কথাটা বলে মাঝিকে পারে নৌকা বাঁধতে বললেন।

যেখানে নৌকা থেকে নামলাম সেখানটা কাদা হলেও উপরের মাটি বেশ শক্ত । নারায়ণ বাবুর সঙ্গে আসা একটি ছেলে, নাম কমল, এখানেই মাটির ওপর সুন্দর একটা উনুন বানিয়ে নিল খুব কম সময়৷ উনুন বানিয়ে সে গেল কাঠ কাঠতে । সুরেশ পাশের গাছ থেকে দুটো বড় দল নিয়ে নদীর ধরে কাদা মাটির কাছে গর্তে দু'জায়গায় দিয়ে কিসর জন্য জানি অপেখ্যা করতে লাগলো। আমিও তার সামনে গেলাম দেখি কিছুক্ষণ পর যখন লাঠিটা বার করলো লাঠির মুখে তিনটে কাঁকড়া, আরেকটা লাঠিতে উঠলো সাতটা কাঁকড়া। এভাবে দু-একবার নানান গর্তে লাঠি দিয়ে কিছু কাঁকড়া তুলে একটা হাঁড়ি করে নদীর জলে ছাড়িয়ে ধুয়ে আনলো। আমি ও অমলেশ সেই সময় নদীর জলে চান করে নিলাম। ওদিকে পরেশ একটা জল নিয়ে কিসব মাছ ধরছে৷ এগিয়ে দেখি ছোট ছোট কুচো মাছ ধরছে । এর পর আমি, অমলেশ, মামা, নারায়ন বাবু ও পরেশ জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে এলাম। হরিণ সহ নানান পশু পাখি দেখলাম৷ আমরা যখন আবার সেই জায়গায় ফিরলাম দেখি রান্না শেষ হয়ে গেছে। আমরা যেতেই খেতে বসে গেলাম৷ শালপাতার থালায় ভাত, ডাল, কাঁকড়ার ঝোল ও চুনো মাছের ঝাল দিয়ে পেট ভরে খাওয়া হলো। খাওয়ার পর আমায় সুরেশ মাটির ওপর নানান পশুদের পায়ের চিহ্ন দেখিয়ে কার কোনটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

নারায়ন বাবু পাশে একটা পায়ের চিহ্ন দেখে বললেন "এই দেখো বাঘের পায়ের ছাপ"।

আমি হা করে কাছ থেকে দেখতে লাগলাম।

"সারা বছর কতো যে প্রাণ নেয় এরা তার হিসাব নেই"নারায়ণ বাবু বলে থামলেন।

"এখানে প্রাণ নেয় ? মানে ?"

"নানা জায়গা দিয়ে চোরা কাঠ ব্যাবসায়ী, তারপর মধু চোর ও নানান মানুষ কাঁকড়া ধরতে মাছ ধরতে আসে ও এদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেয়।"

"মৃত্যু জেনেও তারা আসে ?"

"দেখো সুন্দরবনের সম্পদ অফুরন্ত, জলে কাঁকড়া, মাছ, ডাঙায় পাখি, পাখির ডিম, মধু, কাঠ আরো কতো কি। বহু মানুষ পেটের দায়ে জঙ্গলে আসেন আবার কেউ চুরি করতে আসে। সুন্দরবনের দেবী বনবিবির দয়া থাকলে তারা বেঁচে ফিরে যান। আর যদি রুষ্ট হন তালে এই জঙ্গলেই প্রাণ দিতে হয় "নারায়ণ বাবুর কথা মন দিয়ে শুনে একটি সুন্দরী গাছের তলায় গিয়ে বসি ও প্রকৃতির শোভা দেখতে থাকি প্রাণ খুলে।

আমি বসে আছি আমার কাছে মামা ও নারায়ন বাবুর বন্দুক। হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। পরেশ বাড়িতে নিয়ে যাবে বলে গুলে মাছ ধরছে। অমলেশ ও সুরেশ কাঁকড়া ধরে হাঁড়িতে জমাচ্ছে। বাকিরা নৌকোর কাছে মাঝির সাথে গল্প করছে। হঠাৎ কয়েকটি বাঁদরের চেঁচামেচি শোনা গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন ঠিক আমার ডান পাশ থেকে কাঁকর হরিন ডেকে উঠলো৷ এ ডাক কখন হয় আমি জানি৷ কাছে বাঘ এলে এই ডাক ডাকে কাঁকর হরিন৷ মামা ও নারায়ণ বাবু আমার দিকে তাকালো৷ বাকি দের দেখা যাচ্ছে না৷ আমার সামনে নেই তারা৷ দূর থেকে মামা ও নারায়ণ বাবু আমার দিকে এগিয়ে আসছে শব্দ শুনে৷ কিন্তু তাদের এগিয়ে আসার আগেই যে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হলো তাকে দেখে আমার গা হাত পা ঠান্ডা হয় যাচ্ছিল। হলুদের ওপর কালো ডোরাকাটা দাগ মুখে রক্তের দাগ। মাঝে এসে গা হাত পা ঝাঁকিয়ে সে আমার দিকে তাকালো, আমি কি করব বুঝতে পারলাম না। মামা ও নারায়ন বাবু কিছু বলছিল আমার কানে শুধু কিছু শব্দ এলো কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারলাম না, পা হাত অবশ হয়ে গেল৷ বাঁ হাতে মামার বন্দুক, সেটা চালাবার ক্ষমতা নেই, বাঘটা আমার দিকে তাকিয়ে একটু আসতে করে গজরে উঠলো। ধীরে ধীরে বাঘটা আমার দিকে আসতে লাগলো। মামা ও নারায়ণ বাবুর গলা শুনতে পেলাম বন্দুক দিতে বলছে চেঁচিয়ে। বাকিরা দূর থেকে দৌড়ে আসছে। ঠিক হাত দশ মতো দুরে বাঘটা পেছনের দিকে ঝুকলো ভালো মতো বুঝতে পারলাম এবার বাঘটা আমার গায়ে ঝাপাবার মতলব করছে। সেকেন্ডের মধ্যে বাঘটা ঝাপ দিল আমি দুহাত দিয়ে বন্দুক চেপে ধরে দুটো গুলি ছুড়লাম চোখ বন্ধ করে। কানে শুধু আওয়াজ পেলাম চারিধারে পাখি উড়ছে, পাখি উড়ছে, পাখি উড়ছে৷ তার পর আমার কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরলাম দেখি নৌকার ভেতরে শুয়ে আছি৷ মামা চোখে জল দিচ্ছে৷ উঠে বসতেই নারায়ণ বাবু পিঠ চাপড়ে বললেন " শাবাশ শাবাশ!" আমি তাঁর দিকে তাকাতে উনি নৌকার এক সাইড দেখিয়ে বললেন "তোমার মারা বাঘ"। দেখলাম বাঘটা পড়ে রয়েছে৷ দুটো গুলি মাথায় লেগেছে। মামা পাশ দিয়ে বলে উঠলো "এটার চামড়া পরিস্কার করে দেবো, বাড়ি নিয়ে যাস"।

"এই সেই চামড়া" বললেন প্রোফেসর দত্ত। আমি ঘড়ির কাঁটায় সময় দেখলাম নটা বেজে পনের মিনিট৷

"যা পালা, তোদের আজ পড়াটাই হলনা।" আমরা যে যার নিজেদের বাড়ি ফিরে আসি৷ আসার আগে আরেকবার সেই চামড়াটা দেখি আসি।

কবিতা

বর্তমানের বার্তালাপ

অ নি ন্দি তা জ মা তি য়া

এখন কালি-কলমের যুগলবন্দী আর দেখা যায় না।
তার বদলে কী বোর্ডের নিঃশব্দ আওয়াজে
বর্নে বর্নে শব্দ, শব্দে শব্দে বাক্য, বাক্যে বাক্যে কথা
আর কথায় কথায় গল্প তৈরি হয়,
হরফে হরফে ফোটে ছবি।

এখন ডাকপিয়নের হাঁক আর শোনা যায় না।
তার বদলে নেট দুনিয়ায় মুখ গুঁজে জীবন চলে পথ খুঁজে,
সময় কাটে সম্পর্ক ভাঙ্গা গড়ায়
আর হারিয়ে যাওয়া চিঠির ভিড়ে, আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে
তলায় তলিয়ে যায় সব-ই।

যেথায় আকাশ সাগরে মেশে
সৌম্যদীপ পাল
© Soumyadip
ভূল ভূলইয়ার সেই গলি
রাজর্ষি ঘোষ
Soumyadip
অন্ধকারের উৎস্য হতে
সৌম্যদীপ পাল

গল্প
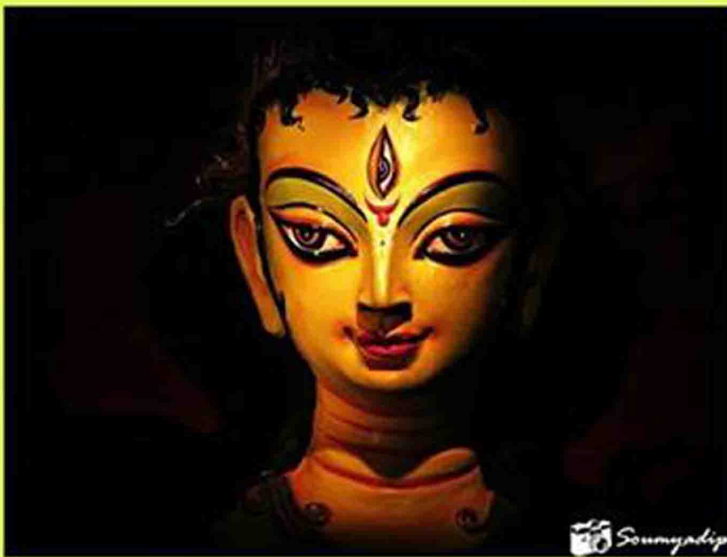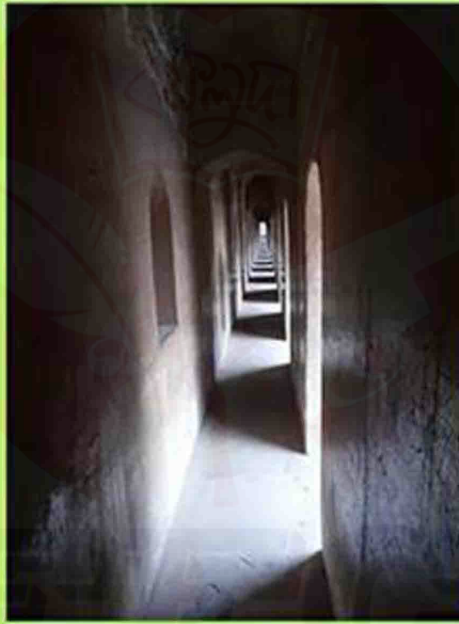
ঋজু পাল

পুজোসংখ্যার গল্প লিখব বলে বসেছিলাম সকাল থেকে। কি যে লিখব মাথাতেই আসছিল না। পাতার পর পাতা হিজিবিজি কাটছি আর কাটছি। ঘরের মেঝেটা ক্রমশঃ বাতিল ছেঁড়া কাগজের আস্তাকুড়ে পরিণত হয়েছে। ধুৎ!!! ভালো লাগছে না---- এই বলে যেই না কানে হেডফোন লাগিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে বসলাম--- অমনি মায়ের চিৎকার- “বাবু দেখ তো, দরজায় কে কড়া নাড়ছে!! ,পারি না আর , স্কুল থেকে এসে রান্না চাপাবো না কে এসেছে সেটা দেখবো!!—কী রে উঠলি???” যা চেঁচামেচি মা শুরু করেছে এরপর না পড়ার লোকে এসে হাজির হয়; এই ভেবে খানিকটা বিরক্ত হয়েই দরজার দিকে এগোলাম।

“কাকে চাই??’’ – প্রশ্নটা করলাম দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে। পরনে ময়লা পাঞ্জাবী আর পাজামা। কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। গালে অনেকদিনের না কাটা দাঁড়ি। চোখগুলো দেখে মনে হল যেন গোটা জগৎসংসারের দুঃখ তার মধ্যে বাসা বেঁধেছে।

“এই যে!! এটা কী 2/বি সিভিল ডিফেন্স রোড??’’

“হ্যাঁ—কিন্তু কাকে চান আপনি??’’ খানিকটা কৌতূহল নিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

“ওহ!! আচ্ছা!! তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসেছি।। কবিতাদি বাড়িতে আছেন???’’

কবিতা আমার মায়ের নামই।

“হ্যাঁ, আছেন, বলুন কী নাম আপনার!!’’ গলার স্বরে আমূল পরিবর্তন নিজেই লক্ষ্য করলাম।

"ইয়ে মানে, নামে বললে উনি চিনবেন না, আমার ছোট মেয়ে ওনার স্কুলে পড়ে। একটু ডেকে দিন না! খুব দরকার।’’ খানিকটা কাঁচুমাঁচু হয়েই ভদ্রলোকে জবাব দিলেন।

‘’হ্যাঁ, নিশ্চই, ভেতরে আসুন আপনি, বসুন আমি মাকে ডেকে আনছি।’’

“ওহ! আপনি মানে তুমি ওর ছেলে---বেশ বেশ।। খুব ভাল”

পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম আমি। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি মা মাছের ঝোল রাঁধতে ব্যস্ত।

‘’মা, কে একজন এসেছেন তোমার সাথে দেখা করতে’’

“কে রে!!”

“নামে জানি না, বলল ওর মেয়ে নাকি তোমার স্কুলে পড়ে, খুব দরকার। যাও, বাইরে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে এসেছি।’’

“ওফ!! এই হল এক জ্বালা, আবার সেই টিউশনের জন্য নিশ্চই!! পারি না আর’’....বলে গ্যাস নিভিয়ে গজগজ করতে করতে মা চলে গেল ড্রয়িং রুমের দিকে।

আমি আবার নিজের কাজে মন দিলাম। বাবা বাড়িতে নেই। কলকাতা গেছে। মা আর আমি একা, কী মনে করে আমিও মার পিছু নিলাম।

মাকে দেখে ভদ্রলোকে উঠে দাড়ালেন। "নমস্কার দিদিমণি!! ভালো আছেন তো??"

প্রতিনমস্কার করে মা বলল-"হ্যাঁ তা আছি, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক....."

কথা শেষ করার আগেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন "আমাকে চিনবেন না, আমার মেয়ে টুম্পা ক্লাস ৫ বি তে পড়ে"

"ওহ, আচ্ছা, কিন্তু আমি তো ক্লাস 5-র ক্লাস নি না.. তা আমার কাছে হয়ত" মার গলায় সন্দেহর সুর।

"না, মনে যে দিদিমণি, কী করে যে বলি আপনাকে, আমি সাহচকের সিমেন্ট কারখানাতে কাজ করি। আজ 3 মাস ধরে কারখানা বন্ধ। দু'বেলা মেয়েদুটোর মুখে যে কিছু তুলে দেব তাও পারছি না, কাজ ও পাচ্ছিনা কোথাও!! এর মধ্যে বাড়ি ওয়ালা দুবেলা তাগাদা দিয়ে গেছে –"তিন মাসের বকেয়া না মেটালে বার করে দেবে!!" বলতে বলতে ভদ্রলোকে কেঁদে ফেললেন।

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম আমি আর মা দুজনেই। কী করে যে ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দেব তার ভাষা খুঁজে পেলাম না।

মনে হয় ভগবান সহায় হলেন---- ভদ্রলোক নিজেই চোখ মুছে ভিজে কণ্ঠস্বরে বললেন—"মাফ করবেন দিদিমণি!! আপনার সময় নষ্ট করছি, যদি কিছু পারেন তো সাহায্য করবেন একটু, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

মা উঠে দাঁড়ালেন।"আপনি একটু বসুন, দে খছি কী করা যায়"--- এই বলে আমায় নিয়ে ভেতরে এলেন।

''কী করি বল তো বাবু, টাকা বেশি তো বাড়িতে নেই, আজ ব্যাংক যাবার কথা ছিল, সব কিছুর চক্করে ভুলে গেলাম। এখন এমন অবস্থায় কী করে ভদ্রলোককে টাকা দি বল তো!!" মা বিচলিত হয়ে পড়লেন।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা জিনিস মাথায় এলো। বললাম "মা, সেমিনার গুলোতে প্রাইজ় পেয়ে যে টাকাগুলো আমি জমিয়েছি সেখান থেকে কিছুটা দিলে কেমন হয়।"

''দিলে তো ভালই হয় রে---কিন্তু ওটা তোর প্রাইজ পাওয়া টাকা বাবু, কী যে করব!"

''তাতে কী হয়েছে মা, আমি তো আর বাজে কিছু কাজে নষ্ট করছি না, তুমি তো বলেছিলে ওখান থেকে আমি নিজের মতো খরচা করতে পারি, ভদ্রলোকের অনেক কষ্ট, তুমি আর না কর না"

মাকে রাজী করালাম কোনোমতে।

লকার খুলে 4000 টাকা মার হতে তুলে দিলাম। মা সেটা গিয়ে ভদ্রলোকের হতে দিলেন।

"আপনি মানুষ নন দিদিমণি। ভগবান!! আপনার এই ঋণ আমি ভুলব না, ঠিক শোধ করে দেবা" ভদ্রলোকের চোখ আনন্দে চক চক করছিল।

''শোধের চিন্তা পরে করবেন, এখন যান মেয়েদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরবেন।" মৃদু ধমক দিল মা।

ভদ্রলোকে নমস্কার করে চলে গেলেন।

আমরাও দরজা বন্ধ করে নিজের কাজে ফিরে গেলাম।

বিকেল বেলা আমার মামা, মামি, মামাতো ভাই, বোনেরা সবাই বেড়াতে এসেছে। সামনেই তো মামাবাড়ী। জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি দাদা আর বোনের সাথে। মারা অন্য ঘরে। এমন সময় আবার সেই দরজার ঠক ঠক....!!!

"মা, কে এসেছে" এবার দরজা খোলার ভার মার উপর চাপালাম। গল্প ছেড়ে কে আর নড়তে চায়। যাই হোক, মা গিয়ে দরজা খুলতে হুরমুর করে ঘরে ঢুকে

পড়ল একটা জীর্ণ, রুগ্ন, ময়লা কাপড় পরা ভদ্রমাহিলা। পেছনে দুটো মেয়ে। একটা ছোট আর একটা একটু বড়।

''একি, তোমরা কারা?? এভাবে ঘরে ঢুকলে কেন??'' মা রেগে জিজ্ঞাসা করল।

''ঢুকব নি!! তো কী বাইরে দাঁইরে সং-এর নেত্য দেখব!! বলি তোমার আক্কেলটা কী গা!! ভর দুপুর বেলা মিন্সে এসে নাকীকান্না গাইলো আর অমনি দয়ার সলিল উথলে উঠল!!!'' ঝাঁঝিয়ে উঠলো বৌটা।

চিৎকার শুনে আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম।

মা অবাক হয়ে বলল---"কে তুমি?? কিসব বলছ?? কিছুই তো বুঝছিনা।।।।।''

''ওগো বলি বোঝার আর বাকি আছে টা কি!! চেনো না শোনো না, একটা পোড়ামুখো মিন্সে কে এককারি টাকা দিয়ে দিলে, আর সে তারি গিলে নেল তে পরে আছে। বলি আমাদের দেখে কী ভিখিরি মনে হচ্ছে তোমার??''

মা হতবাক হয়ে বলল—"ওমা!! উনি তো বললেন মেয়েদের অসুবিধা হচ্ছে, কারখানা বন্ধ।''

''কারখানা!!! ও আবার কবে কারখনায় গেল গা!! ও মিন্সে ঠগ গো। ঠগ। মিষ্টি মিষ্টি কথায় তোমাদের মত বোকাদের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙ্গে খায়। কী দেখে যে আমার বাপ মা ওর হতে আমায় তুলে দিয়েছিল কে জানে!! পাপের ফল। শোনো দিদিমণি, ও টাকা তোমার জলে গেছে গো। এই মেয়েগুলোর কিছু ভোগে লাগেনি। নেহাত ২ বাড়ি বাসন মাজি।। তাই টিকে আছি। নয়ত কবেই...।!!!'' কাঁদতে কাঁদতে বৌটা মেয়েগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

সবাই চুপ। ড্রয়িং রুমে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল।

মার মুখ থমথমে। সেটা রাগ না অভিমানে বুঝলামনা।

ছোটমামি বলল "হল তো বাবু। আরও বেশি সমাজসেবা করতে যা। এই হবে। ক্যবলাকান্ত একটা!!!''

বাকিরা হাসিতে ফেটে পড়ল। মামাতো দাদা বলে উঠলো "পিসি!! তোমার এই ছেলেকে মানুষ করা খুব কঠিন!! দু'দিন পর মুম্বাই গিয়ে কী যে করবে সেটা ভেবেই চিন্তা হয়। বোকা কোথাকার''।

সবার ব্যাঙ্গতে বিরক্ত হয়ে মা মাথা নিচু করে পা বাড়ালো রান্নাঘরের দিকে।

হঠাৎ কেন জানি না, মনে একটা অদ্ভুত বল পেলাম, একটা অন্য রকম অনুভূতি হল। কে যেন আমার মুখ দিয়ে বলে উঠলো। "সে ভাই তোরা আমায় যতই বোকা বলিস, যতই ক্যবলাকান্ত বলিস। কাল যদি এই ভদ্রলোকের জায়গাতে অন্য কেউ কাঁদতে কাঁদতে আসেন----আমি আবার দেব। হ্যাঁ, আবার দেব। এই স্বভাবটা শোধরাতে পারবনা।''

আমার দৃঢ় অথচ মৃদু গলার স্বরে থমকে দাঁড়াল মা। দেখলাম মার চোখে জলের ধারা।

জড়িয়ে ধরে মা বলল "না, তোকে শোধরাতে হবে না, কোনোদিনও শোধরাতে হবে না। এমন ভুল যেন তুই বারবার করিস, বারবার।!!''

কবিতা

ঋতুরাণীর সাজে

জহুরুল ইসলাম

বর্ষা এলো, বর্ষা এলো, গাই বর্ষার গান,
ব্যাঙ ডাকে ওই পুকুর ডোবায় ঘ্যাঙর ঘুঙুর তান।

শ্রাবণ আকাশ ঘনিয়ে এলো কালো মেঘের রাশি,
ঘনঘটায়ে বৃষ্টি এলো শোনো মেঘের অট্টহাসি

বজ্রনিনাদ শব্দ শুনে দুরুদুরু বুক,
গুঁড়িশুড়ি মায়ের কোলে প্রাণ করে ধুকপুক

অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে বাইরে না যায় লোক,
ব্যাঙের মায়ের মরল খোকা করছে বুঝি শোক

পোকা ডাকে ব্যাঙও ডাকে রাতের আঁধার কালো,
ঝাপ্টা লেগে ভিজলো বিছান পিদিমখানি জ্বালো

আগুন ঝরা রোদের বেলায় জ্বালিয়ে গেছে প্রাণ,
গাছপালা তাই মনের সুখে করছে দেখো স্নান

চাষির মুখে সুখের হাসি হবে এবার চাষ,
আনন্দেতে নাচছে পোকা নাচছে মাঠের ঘাস

লোকজন সব গৃহবন্দি নেই কোনো কাজ,
নিঃশব্দে করছে উপভোগ ঋতুরাণীর সাজ॥

গল্প

মাই ডিয়ার ড্রাকুলা

ডা. অশোক দেব

বেশ কিছুদিন ধরেই শুনছিলাম, বিশ্বনাথ, অর্থাৎ আমাদের সবার প্রিয় "বিশে" নাকি আর ঘর থেকে বেরুচ্ছেনা, অফিস যাচ্ছেনা। দোকান-বাজার কোথাও নয়। কারোর সাথে দেখা করছেনা। খুব কদাচিৎ নাকি মোবাইল ফোনে কল এলে রিসিভ করছে। আমি অনেক বার চেষ্টা করেছিলাম। ধরেনি। ব্যাপারটা ভীষণ গুরুতর মনে হলো,-যখন শুনলাম ওর বৌ নাকি বাচ্চাকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে।

বিশু থাকে আমার বাড়ির থেকে মাইল খানেক দূরে, গীতাঞ্জলী অ্যাপার্টমেন্টের চারতলার ২২ নম্বর ফ্ল্যাটে। কাজের চাপে বেশ কিছু দিন হলো দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে না। আগে যখন ওদের বাড়ি প্রায়সই যেতাম, -তখন জমিয়ে আড্ডা হতো। বিশে বেশ আসর জমিয়ে দিত। গানের গলাটাও ছিল বেশ ভালো। কিন্তু হঠাৎ এমন কি হলো,-যে বিশেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে হলো!

যাই হোক, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম- আজই অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যের মুখে বিশের বাড়ি যাবো। দেখতেই হবে – ব্যাপারটা কী।

যেমন ভাবনা-তেমনই কাজ। বহুদিন পরে যাচ্ছি, আর বেচারি একা একা আছে বলে পাড়ার দোকান থেকে গরম গরম সিঙাড়া আর খাস্তা কচুরি নিয়ে সাইকেল রিক্সায় চেপে পৌঁছে গেলাম ওদের আবাসনে। কোন যান্ত্রিক গোলোযোগে লিফট চলছেনা। তাই অগত্যা সিঁড়ি চড়তে হলো। এক নয়, দুই নয়, চারতলা। অনভ্যাসের ফলে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। চারতলায় পৌঁছোনোর ঠিক আগেই এক ভদ্রমহিলাকে দেখলাম- সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। আমাকে দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভদ্রমহিলাকে দেখে খুবই বিপর্যস্ত মনে হলো। তার চোখে জিজ্ঞাসা। মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

-আপনি কি বাইশ নম্বরে যাচ্ছেন ?-

ভদ্রমহিলার হাবভাব ও প্রশ্নে আমিও চমকে গেলাম। বললাম, -হ্যাঁ, কেন বলুনতো ?

ভদ্রমহিলা এবারে মুখে বেশ কাঠিণ্যের ভাব এনে বললেন,

- আপনি কি ওঁর বন্ধু না আত্মীয় ?-

আমি সরাসরি উত্তরটা দিতে পারতাম, -কিন্তু আরও সিওর হবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম,

-কার কথা বলছেন বলুন তো ?-

মহিলা এবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলেন, -বললেন- ২২ নম্বরে তো বিশ্বনাথবাবু থাকেন। আমি আর কার কথা বলব ?—একা যাচ্ছেন, সাবধানে থাকবেন। এই

বলে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেলেন। আমি ঐ সিঁড়ির ধাপেই কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

নিজেকেই প্রশ্ন করলাম,- কি জিতেন, তুমি কি ভয় পেয়েছো ?- ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে সাহসী ছেলে হিসেবে আর দুর্নাম ছিল। পাড়ায় একবার কে যেন গলায় দড়ি দিয়েছিল। তারপর বেশকিছুদিন সবাই সন্ধ্যের পরে ঐ জায়গাটার পাশ দিয়ে যেতো না। আমার কিন্তু একটুও বুক কাঁপতো না। অথচ ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আমি মুখ বাড়িয়ে দেখেছিলাম দেহটা। মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরিয়ে শুকিয়ে গেছে। জিভটা অনেকখানি বেরিয়ে, -বিস্ফারিত চোখ। লোকজন এমন ভয় পেয়েছিল যে হপ্তা দুয়েক ঐ পথ মাড়ায়নি।

ধান ভাঙতে শিবের গীত গেয়ে লাভ নেই। এবার মনটাকে গুছিয়ে ভাবলাম—আমার প্রিয় বন্ধু-নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। যতটুকু পারি সাহায্য করব। সুইচ টিপতেই ভেতরে কলিং বেলের আওয়াজ। মনে হল একটা ক্ষীণ গোঙানির শব্দ পেলাম। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মনে হল– আই হোলের মধ্যে দিয়ে কে যেন আমাকে দেখছে। কয়েক মুহূর্ত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমাকে চমকে দিয়ে সশব্দে দরজা খুলে গেল। আর ভেতর বেশ অন্ধকারের মধ্যেও পরিস্কার বুঝলাম-কে যেন দরজাটা খুলে দিয়েই দৌড়ে ভেতরে আরও ঘন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমি অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যে দরজাটা সুইং খেয়ে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আমি দেয়াল হাতড়ে সুইচ খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে থেকে নির্দেশ এলো,-লাইট জ্বালানোর চেষ্টা করিস না।-- সেই পরিচিত কণ্ঠ, কিন্তু বেশ কর্কশ আর খোঁনা। -- তোর ঠিক বাঁ পাশেই সোফা আছে। ওখানে বসে পড়। আর তোর হাতের প্যাকেটটা সোফার ওপরই রেখে দে। বাজে তেলেভাজা খাওয়ার অভ্যাসটা তোর এখনও যায়নি দেখছি।

আমি কেমন যেন সম্মোহিতের মতো বাঁদিকে সরতে গিয়ে সোফার হ্যান্ডেলে ধাক্কা খেয়ে সোফার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কোনরকমে সামলে নিলাম। সিঙারার প্যাকেট কোথায় যেন ছিটকে গেছে। এ হেন করুণ অবস্থায় অন্ধকার থেকে ভেসে এলো বহুদিন আগের সেই ফিচেল হাসিটা। হেসেই চলেছে। থামছেনা কিছুতেই। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। অন্ধকারের অভিমুখে চিৎকার করে বলে উঠলাম – অ্যাই-থাম তুই। এসব কি মস্করা হচ্ছে! – হাসির দমক আরও বেড়ে গেল। ঐ দমবন্ধকরা অন্ধকার ঘরের প্রতিটি দেয়ালে অনুরণিত হতে থাকল ঐ হাসির আওয়াজ।

সব ধন্দ কাটিয়ে মনটাকে শক্ত করে সহজ হবার চেষ্টা করলাম। বললাম – আলো জ্বালছিস না কেন বিশে?- আমি তো তোকে দেখতে এসেছি। শুনলাম তোর নাকি বড় অসুখ করেছে, কি হয়েছে তোর?-আমাকে বল্। যত কঠিন অসুখই হোক- বড় ডাক্তার দেখিয়ে ঠিক করে দেব।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা কাটিয়ে বিশে বলল—দিন পাঁচেক আগে ডাক্তার প্রণব ভট্টাচার্য এসেছিলেন। ঢুকতে সাহস পাননি। পরে মিতা বলল-আমার নাকি রক্ত পরীক্ষা হবে। দিন দুই আগে একটা ছোকরা এসেছিল চার পাঁচজন মস্তানকে নিয়ে। আমাকে বেঁধে শিরার থেকে রক্ত নিল- জানিস। তারপরই আমি আর শান্ত হয়ে থাকতে পারিনি। পরের দিন সকালে আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। পাশের ফ্ল্যাটের বৌদি..আমার বৌ আর ছেলেকে নিয়ে চলে গেলো। পরে মিতা বাপের বাড়ির থেকে ফোন করে জানালো যে ওরা এখন ওখানেই থাকবে।

--তাহলে তোর খাওয়া দাওয়া?—

--পাশের ফ্ল্যাটের বৌদি টিফিন কেরিয়ারে করে আমার দরজার সামনে রেখে যায়।

চোখটা খানিকটা অভ্যস্থ হয়ে যাওয়ায় আমি ধীরে ধীরে এদিক ওদিক তাকিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করছি—সুইচ বোর্ডটা কোথায় হতে পারে।

বিশে বলল—আমি বুঝতে পারছি যে অন্ধকারে তোর খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে দুমিনিট টাইম দে। তারপর সোফার পিছনে সুইচ বোর্ডটা খুঁজে নিয়ে আলোটা জ্বালা।

আমার মনটা নরম হয়ে এলো। বললাম তোর অসুবিধে হলে তার দরকার নেই।

নাঃ-একবার জ্বাল। এতদিন পরে তুই আমাকে দেখতে এসেছিস। তবে একটা কথা। তুই আমাকে দেখে ঘাবড়ে যাস না বা মন খারাপ করিস না।

ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে আমি কেমন যেন মোহগ্রস্তের মতো উঠে দাঁড়ালাম। একটু পিছিয়ে গিয়ে দেয়াল হাতড়ে পেয়ে গেলাম সুইচ বোর্ড। পর পর দুটো সুইচ জ্বালতেই ঘরটা আলোয় ভরে উঠল। এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর এই আলোটাও যেন আমার চোখে এসে লাগল। সবকিছু পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি। এবার সহজেই সোফায় এসে বসলাম। ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বোলাতেই চারিদিকের ধুলোমলিন আসবাবগুলো নজরে এলো। বহুদিন এই ঘরের পরিচর্যা হয় নি। ঘরের কোনে কোনে ঝুল আর মাকড়সার জাল। আমার অদূরেই একটা ডাইনিং টেবিল। আর তার পাশেই একটা চেয়ারে বাদামী একটা কম্বলে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত ঢেকে বসে আছে আমার প্রিয় বন্ধু বিশে। ডাইনিং টেবিলের ওপরে থরে থরে জমে আছে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের টিফিন বাক্স আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আধখাওয়া হাড়গোড়, ভাঙা গ্লাস, বাটি আর প্লেট।

কম্বলের ভিতর থেকে বিশে বলল," বেশিক্ষণ আলোটা জ্বালিয়ে রাখিস না।" ---

এমন সময় আমার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। আমি ফোনটা রিসিভ করলাম। আমাদের আড্ডাসঙ্গী বিনয়ের ফোন। ও খবর পেয়েছে যে আমি বিশের বাড়িতে এসেছি, তাই ও আসছে। আমি ওকে বারণ করতে পারিনি। ফোনে কথা শেষ হয়ে গেলে আমি আলো নিভিয়ে আবার সোফায় বসে পড়লাম। বিশে বলল- "থ্যাংক য়ু।"

আমি মোবাইলটাকে সোফায় আমার পাশে রেখে বসলাম। কয়েক লহমায় ভেবে নিলাম,- কি দেখেছি। কম্বলের আড়ালে যে ব্যাক্তি,--সেই কি সত্যিই আমার বন্ধু বিশে !! একমাত্র কণ্ঠস্বর ও আন্তরিকতা ছাড়া তো সে কথা বোঝার উপায় নেই। বরং কম্বলের তলা দিয়ে যে শীর্ণ হাত দুটো দেখা যাচ্ছিল- তা কোন স্বাভাবিক মানুষের হওয়া সম্ভব নয়। চামড়ার রং ফিকে সবুজ। সরু সরু আঙুলের ডগায় লম্বা বাঁকা নখ। পায়ের অবস্থাও তথৈবচ।

হঠাৎ বিশের কথায় চমকে উঠলাম। "--কি রে, এতো কি ভাবছিস?"

--"নাঃ, তেমন কিছু নয়, ভাবছিলাম যে তোর ব্লাড রিপোর্টগুলো কবে আসবে।"

---আবার সেই হাড়জ্বালানো হাসি।

" --ব্লাড রিপোর্ট !!—মিতা এখন ওসব বিশ্বাস করেনা। ও একরকম নিশ্চিত যে আমার ওপর কোনও পিশাচ ভর করেছে। কিছুদিন আগে গুণীন ডেকেছিল। আমার কামড় খেয়ে সে ভেগেছে। যাবার আগে মিতাকে শিগগির ঘর ছাড়ার পরামর্শ দিয়ে গেছে।"

-"কামড় !! – তুই গুণীনকে কামড়াতে গেলি কেন ?"

--"সেটাই তো কথা। আমার মাঝে মাঝেই দাঁতগুলো বড্ড শিরশির করে। তখন হাতের সামনে- থালা বাটি,ফুলদানী-যা পাই কামড়াই। সে হতভাগা আবার যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়েছিল। তোর মতো বোঝদার কি আর সবাই হয় বল। এমনিতেই তখন আমার দাঁত,মাড়ি সব শিরশির করছিল, তারমধ্যেই ফস করে আমার মুখের সামনে দিলো আগুন জ্বালিয়ে তাই যা হবার তা হয়েছে। আমি লাফিয়ে গিয়ে দিলুম ওর ঘাড়ে এক কামড় বসিয়ে। যাকগে অনেক কথা হলো। আমি বেশিক্ষণ একটানা বসে থাকতে পারিনা। এবার আমি শুয়ে পড়ব। তুই যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যাস।

আর একটা কথা,-তুই আমার প্রিয় বন্ধু, তাই তোর ওপর নিশ্চই এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারি যে তুই আমার ব্যাপারে চারিদিকে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বেড়াবি না ....!"

আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম। দরজার দিকে ধীরে ধীরে এগোতে গিয়ে মনে হলো মোবাইলটা যেন কোথায় ফেলে এসেছি। তাই হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ জ্বালিয়ে দিলাম। চকিতে যে ঘটনাটা ঘটল- তার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলামনা।

আমার থেকে প্রায় দশফুট দূরে বসে থাকা মানুষটা হাড় হিম করা একটা জান্তব আওয়াজ করে আমার ওপরে লাফিয়ে পড়ল। এক ঝলক ওর মুখটা দেখতে পেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। আর যেই হোক এ বিশে হতে পারেনা। প্রায় রক্তবর্ণ দুটো বিস্ফারিত চোখ, পাংশু সবজে মুখের ঐ আদিভৌতিক প্রানীটার সব দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তারমধ্যে দুটো ধারালো শ্বদন্ত চোখে পড়ল। আমার ঘাড়ের কাছে ওর মুখ। এমন সময় দড়াম করে দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল বিনয়। পিছনে চাবি হাতে বিশের স্ত্রী মিতা। সিঁড়ির থেকে একরাশ আলো ছিটকে পড়ল ঘরের ভিতরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দিয়ে অসহায় জন্তুর মতো ছিটকে চোখের পলকে বিশে ঢুকে পড়ল ভিতরের একটা ঘরে। আমরা বন্ধুরা মিলে বিশেকে ভর্তি করালাম শহরের এক নামী নার্সিং হোমে।

তারপর নিয়মিত খবর রাখতাম। জোরদার চিকিৎসা চলছিল। মাসখানেক যেতে না যেতেই এক দিন সকালে বিনয়ের ফোনে বিশের মৃত্যুসংবাদ পেলাম। শেষ হল এক ভয়ংকর পিশাচের কাহিনী। আসলে পিশাচ নয়। বিরল রোগগ্রস্ত এক হতভাগ্য রোগী। পরে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, - রোগটির নাম ইন্টারমিটেন্ট পরফাইরিয়া। আরেক নাম, - ড্রাকুলা ডিজিস।

সোনার কেল্লা (১৯৭৪)

জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৯)

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে (২০০৩)

কৈলাসে কেলেঙ্কারী (২০০৭)

টিনটরেটর যীশু (২০০৮)

গোরস্থানে সাবধান (২০১০)
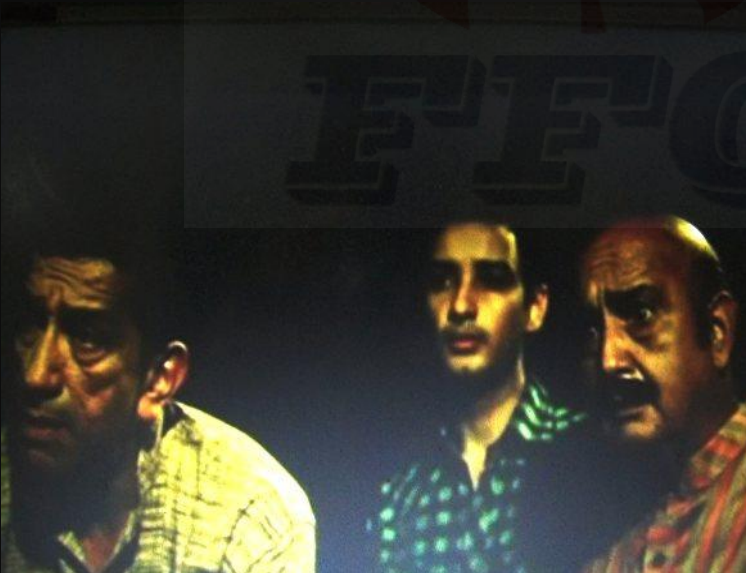
রয়াল বেঙ্গল রহস্য (২০১১)

বর্ষার দিনে

মোঃ আঃ মুকতাদির

ছয়টি ফুলের মাঝে ফোটে
একটি ফুল সহসা,
রিমঝিম ছন্দ নিয়ে
কাছে এল বরষা।
বাদল প্রাতে আমি
সব কাজ ভুলি,
বৃষ্টির সাথে আজ
করব মিতালি।
বর্ষার দুপুরে বৃষ্টিস্নাত আমি
শিহরিত মনপ্রাণ,
ভালো লাগে কবিতা
বর্ষার গান।
রাতের প্রহরে ভাসে
এ কোন দিনের স্মৃতি,
পড়ে আছে ঝাপসা
হয়ে গেছে ইতি।
অঝোর ধারার সুর শুনি
ঘুম নাই মোটে,
বৃষ্টির সাথে গেল
সারাটা দিন কেটে।

দেওয়ালের লিখন

দেবায়ন ঘোষ

অ্যাডিলেডে শেষ ইনিংস খেলতে নামার সময় তিনি কি ভাবছিলেন ? আর যাই হোক, ওয়াংখেড়েতে শচীন তেন্ডুলকার অথবা নাগপুরে সৌরভ গাঙ্গুলির থেকে যে আলাদা চিন্তাধারা ছিল, তা বলাই যায়। কারন তখন রাহুল শরদ দ্রাবিড়ের জানা ছিল না যে তিনি ভারতের হয়ে আর মাঠে নামবেন না । শেষ ইনিংসে ২৫ রান নেহাতই কাব্যিক নয় । সিরিজটাই যে অভিশপ্ত। শচীনের মত তাকে ১০০ তম সেঞ্চুরির অপেক্ষা সামলাতে হয়নি । সৌরভের মত ভারতের মাটিতে বিদায় হয়নি। তবে রাহুল আর কবেই বা সে সরণিতে হেঁটেছেন ? ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান যে চিরকালই অন্তরালে কাটিয়ে গেলেন ।

সময়টা জুন মাস। সদ্য বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। উপমহাদেশে হওয়ায় তার রেশ এখনও কাটেনি। এরই মধ্যে ভারতের ইংল্যান্ড ট্যুর। ২০১১ নয়, ১৯৯৬! সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে সুযোগ পেলেন। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের লর্ডস । অসাধারন খেলে ৯৫ করলেন । কিন্তু মহারাজের মহাকাব্যিক সেঞ্চুরির পাশে তা নেহাতই জটায়ুর আসন। রাহুল কি আজ ভাবতে চান - 'যদি সৌরভ সেঞ্চুরি না পেতেন? যদি আমার নামের পাশেই একটা ১৪০* থাকত ?' - এই লেখা পড়লেও হয়ত ভাববেন না। এতটাই সজ্জন তিনি ।

নিন্দুকেরা বলেছিল ওনার খেলার গতি ঢিমে৷ জবাব দিলেন সেঞ্চুরি দিয়ে। তাতেও খুশি না। ৫০ ওভারের খেলায় ওঁকে দিয়ে হবে না। অতএব ১৯৯৯ ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে সর্ব্বোচ রান৷ টিমে ঢুকে গেলেন স্থায়ী ভাবে। অথচ আবার ফর্ম পড়তেই বাদ দেওয়ার দাবি। সৌরভই ফিরিয়ে আনলেন উইকেটকিপার হিসেবে৷ ২০০২ এ ওভালে অনবদ্য ডবল সেঞ্চুরি। রাহুল দেওয়ালে পিঠ ঠেকতেই দেননি।

২০১১ ইংল্যান্ড সফরে যখন যাচ্ছেন তখন ভারত বিশ্বজয়ী। তিনি বুড়োর তকমা পেয়ে গেছেন। কদিন আগের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সেঞ্চুরি করেও সমলোচোকদের হাত থেকে নিস্তার নেই। রাহুল জানতেন এবার কিছু না করলে আর কোন সুযোগ নেই৷ চেতেশ্বর পূজারা অপেক্ষা করছেন। তাই তিনটে অসাধারন সেঞ্চুরি, ওপেনার না থাকায় এক নম্বরে ব্যাট করতে যাওয়া, একদিক ধরে রেখে অসহায়ভাবে অপরদিকে ব্যাটসম্যানদের তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পরা সহ্য করা, ফলো অন করে প্রথম ইনিংসে নট আউট থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে আবার নেমে পরা, রাহুল এসবই করেছেন। নিজে ভাঙেননি৷ তাই তো তিনি এক বিশ্বাসযোগ্য দেওয়াল৷ ভারতীয় ক্রিকেটের মিঃ ডিপেন্ডেব্‌ল৷ দ্যা ওয়াল।

আশ্চর্য এই, যে রাহুলকে মনে রাখার জন্য ঘটনা সব ট্র্যাজিক। কিন্তু ওনার ভক্তকুলের মধ্যে কিছু সংখ্যা তো রয়েছে যারা রাহুলের ২০১১ নয় ২০০৭ এর ইংল্যান্ড সফরকে বেশি মনে রাখবে। ১-০ সিরিজ জিতে আসার জন্য। পাকিস্তানে ২০০৫-০৬ এ সিরিজ জেতা৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৩৫ বছর পর টেস্ট সিরিজ জেতা। রাওয়ালপিন্ডির দুর্ধষ ২৭০, ইডেনের ঐতিহাসিক ফল অন টেস্ট এবং অবশ্যই অ্যাডিলেডের ডবল সেঞ্চুরি৷ যা অতি অবশ্যই বিদেশের মাটিতে খেলা কোন ভারতীয়র অন্যতম সর্বকালের সেরা ইনিংসের এর মধ্যে থাকবে।

ফ্যাব ফোর এর মধ্যে তিনিই যে ভারতের অন্যতম ভরসাযোগ্য ব্যাটসম্যান তা নিয়ে আজ সন্দেহ নেই। ধৈর্য আর অধ্যাবসায়, এই দুইয়ের অসাধারন মিলন রয়েছে তাঁর খেলায়। সেহবাগের মত সেই বিস্ফারণ নেই যে তিনি নেমেই ৩০ বলে ৫০ করবেন। সচিনের মত আগ্রাসন দেখাবেন না যে সব বোলারকেই পাড়ার খেলোয়াড় ভেবে ঠ্যাঙাতে নামবেন৷ সৌরভের রাজকিয়তাও নেই যে স্পিনারদের কথায় কথায় গ্যালারি পার করে দেবেন৷ এমনকি লক্ষনের শিল্পের ছোঁওয়াও নেই যে অসাধারন সব ফ্লিক বেরোবে হাত থেকে। তিনি বরাবরই ধ্রুপদী ঘরানায় বিশ্বাসী। তাই সেই বিখ্যাত কভার ড্রাইভ অথবা অনবদ্য লেগ গ্লান্স আজও ইউটিউবে চলে। তবে টেস্ট এবং ওয়ান ডে, দুটোতেই ১০০০০ এর ওপরে রান করা কর্নাটকের ব্যাটসম্যান আজও সেই একই রকম আছেন৷ নির্লিপ্ত, অমায়িক ধারভাষ্য করেই তিনি জনপ্রিয়৷ সৌরভের মত অতটা সহজ না হলেও তিনি নিজের ঘরানা থেকে সরেননি। এই মরসুমে ইংল্যান্ডে ভারতীয় দল ৫ টেস্টের সিরিজ খেলছে৷ অবসরের পর প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেলেও আজও ওপেনারদের মধ্যে প্রথমজন আউট হলেই ভারতীয়দের বুকে সেই ক্ষীণ আশা জমেই মিলিয়ে যায়।

দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান যে মাঠের বাইরে !
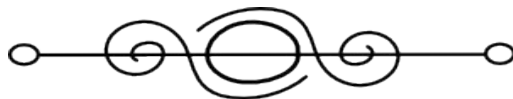
অচেনা আর চেনা - রৌনক ব্রাউন

দুঃসাহসিক ঝড় ও একটি জাহাজ - রৌনক ব্রাউন

গল্প

সার্থক মরণ

উজ্জ্বল দত্ত

(১)

আজ ৩১শে ডিসেম্বরের রাত। সারা উত্তর ভারতে প্রচন্ড ঠান্ডা পড়েছে। বিকেল থেকেই কনকনে হাওয়া চলছে। আমি আমার ছেঁড়া জামাটা গায়ে জড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে রাজধানী দিল্লির এক অভিজাত পাড়ার এক বড় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছি।

আজ ঠান্ডা একেবারে ভেতরের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আমি যে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছি তা রাজধানী দিল্লির অন্যতম ব্যস্ত ও অভিজাত পাড়ায়। একটু দূরেই এক বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট। আমার বন্ধু ভিখারি ল্যাংড়া একবার বলেছিল যে ওই রেস্টুরেন্ট নাকি থিরি-ইস্টার। ল্যাংড়া নানারকম খবর রাখত। বেচারা কয়েক মাস আগে এই রাস্তাতেই গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে। তবে ল্যাংড়াও বলতে পারেনি যে থিরি-ইস্টার মানে ঠিক কি। তবে দেখেছি যে ওই রেস্টুরেন্টে সন্ধ্যার পর বড় বড় গাড়িতে করে ভাল জামাকাপড় পরা লোকজনেরা আসে। তখন আশেপাশে থাকতে পারলে ভাল ভিক্ষা পাওয়া যায়। তবে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। রেস্টুরেন্টের গার্ডরা দেখতে পেলেই ছুটে আসে আর এলোপাথাড়ি হাতের ব্যাটন দিয়ে মারতে থাকে। তখন আবার দৌঁড়ে পালাতে হয়।

চারদিক আলো ঝলমল করছে। রাস্তায় লোকের ভিড়। গাড়ির ভিড়। কত লোকের কত দিকে আসা যাওয়া। রেস্টুরেন্টের বাইরেও দেখছি আজ খুব সাজিয়েছে। চারপাশ গমগম করছে। যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে, তবে থেকেই দেখছি এই ৩১ শে ডিসেম্বরের রাতে লোকেরা আনন্দ করে। ঠিক রাত বারোটার সময় সবাই হই-চই শুরু করে, বাজি-পটকা ফাটায়, গাড়িগুলো হর্ন বাজায়, কেননা সে সময় থেকে নাকি ১লা জানুয়ারি ও নতুন বছর শুরু হয়। তবে তার জন্য এত আনন্দ করার কি আছে তা আমার মত ফুটপাথের ভিখারি অবশ্য বলতে পারবে না।

অবশ্য নতুন বছরের প্রথম দিনে ল্যাংড়া প্রত্যেকবার আমাকে ভালমন্দ কিছু না কিছু খাওয়াত। বলত যে, বছরের প্রথম দিন একটু আনন্দ করা উচিৎ।

(২)

"... বাবুজি...বাবুজি...বাবুজি...অন্ধকে কিছু দিয়ে যান। ভগবান আপনার ভালা করবেন...গরীবকে দয়া করুন বাবুজি... মাইজি... মাত্র এক টাকার সওয়াল... আপনার পরিবারকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করবেন... সাঁই বাবা... হর ... হর... মহাদেব... আপনারদের কল্যাণ করবেন...এই গরীব লাচার অন্ধকে কিছু দিয়ে যান..."

আমি তোতাপাখির মত চেঁচাতে চেঁচাতে হাত বাড়িয়ে ধরি। কখনও বা হাতে ধরা অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোটা শব্দ করে নাড়তে থাকি। এসব বাঁধা গৎ আমার মুখস্থ। গলার আওয়াজ সুবিধামত কমিয়ে বাড়িয়ে কিভাবে করুন সুরে ভিক্ষা চাইতে হয়, তাও

আমার জানা। অবশ্য শুধু আমি কেন, বোধহয় সব ভিখারিরই এসব কায়দা জানা থাকে।

আরেকটা কথা আপনাদের চুপি চুপি বলে রাখি যে আমি মোটেও অন্ধ নই। তবে অন্ধ সেজে থাকলে লোকেরা ভাল পয়সা দেয়। দিল্লির প্রায় সব ভিখারিরাই দরকার মত অন্ধ, কালা, ল্যাংড়া, লুলা, বোবা সাজতে পারে। অবাক হবেন না শুনে যে আমিও বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি ও ইংরেজিতে ভিক্ষা চাইতে পারি।

এসব অনেক কিছুই আমাকে ল্যাংড়া শিখিয়েছিল। আহা! বেচারা মরে গেল। ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন। অবশ্য ভগবান আর আত্মা কি বস্তু তা আমি জানিনা। এবং ভগবান কিভাবে ল্যাংড়ার আত্মাকে শান্তি দেবেন তাও জানি না। বোধহয় ল্যাংড়াও জানত না। তবে শুনেছি বড় বড় লোকেরা মরা মানুষদের সম্বন্ধে এভাবেই বলে থাকেন।

আজ ল্যাংড়ার কথা মনে পড়ে গেল। তাই আমিও ওভাবে বললাম।

(৩)

"...বাবুজি...মাতাজি...এক রুপেয়াকা সওয়াল হ্যায়... অন্ধা লাচার কো কুছ দান দিজিয়ে হুজুর"... এসব বুলি আওড়াতে আওড়াতে আমি আমার কৌটোর দিকে তাকাই। পয়সা ভালই পড়ছে। তবে আমার মত ভিখারিরা আর কে কবে পয়সা জমাতে পেরেছে? চুল্লু, সাট্টা, জুয়া এতেই সব পয়সা উড়ে যায়। আমিও এর বাইরে নই। নয়তো রাজধানী দিল্লিতে ভিক্ষা করেও যা পয়সা রোজগার করা যায়, তা জমাতে পারলে কয়েক বছরের মধ্যেই পয়সাওয়ালা হওয়া যায়।

নাঃ বেশ ঠান্ডা পড়েছে। কালই পুরানো কাপড়ের দোকান থেকে একটা সোয়েটার কিনতে হবে। আজ আর কাল চুল্লু আর সাট্টার চক্করে না পড়লে যা পয়সা হাতে থাকবে তাতে একটা পুরানো সোয়েটার কেনা হয়ে যাবে। আহা, বেচারা ল্যাংড়া! চুল্লুর নেশায় রাস্তা পার করতে গিয়েই তো গাড়িতে ধাক্কা খেল ও মরল।

রেস্টুরেন্টের বাইরে বড় বড় গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে। যাই ওদিকে গিয়ে দাঁড়াই। তাহলে বেশি পয়সা পাওয়া যাবে।

রেস্টুরেন্টের কার পার্কিং-এর কাছে এসে যেই বাঁধা বুলিগুলো আওড়াতে যাব অমনি আমি হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপরেই দেখলাম যে আমার শরীরটা মাটিতে পড়ে আছে আর আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি।

এটা কিরকম হল? একে কি মরে যাওয়া বলে নাকি? বধহয় আমি মরেই গেছি। কিন্তু মরলাম কেন? ঠান্ডার জন্যেই বোধহয়। ঠান্ডাটা হঠাৎ বুকে ধাক্কা মেরেছে। বাঃ! হাত পা গুল তো বেশ হাল্কা লাগছে।

(৪)

আমাকে পড়ে যেতে দেখে রেস্টুরেন্টের দু'জন গার্ড ছুটে এসেছে। একজন বলল, "শালা ভিখারি আর মরবার জায়গা পেল না। একেবারে এখানে এসেই পড়ল। এই... ওঠ বলছি... ওঠ এখান থেকে।"

অন্য গার্ডটা নিচু হয়ে আমার শরীরটা উলটে দিল। তারপর বলল, "দ্যাখ তো কি ঝামেলা, ব্যাটা বোধহয় সত্যিই মরে গেছে রে।"

আমি পাশ ঠেকে চেঁচিয়ে গার্ড দুটোকে কিছু বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা কেউ আমার কথা শুনতে পেল না। এতক্ষণে আমার বিশ্বাস হল যে আমি সত্যিই মরে গেছি। খুব অদ্ভুত লাগল। তারপরেই মনে হল যে এ একরকম ভালই হল। মরে গেলে শুনেছি ক্ষিদে তেষ্টা পায় না। কোনও কষ্টও থাকে না।

আমার বাবা-মা কে আমি জানিনা, জন্ম থেকেই ফুটপাথে অন্যের দয়ায় বড় হয়েছি, ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খেয়েছি। কুকুর বেড়ালের মুখ থেকেও খাবার ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হয়েছে কতবার।

তারপর একটু বড় হতেই ভিক্ষা শুরু করেছি। ল্যাংড়ার সাথে পরিচয় হয়েছে। ওর ইতিহাসও অনেকটা আমারই মত। চুল্লু আর সাট্টার নেশাও হয়েছে আস্তে আস্তে। তার জন্য ভিক্ষায় ভাল পয়সা রোজগার করলেও, সব উড়ে গেছে। চুল্লু সাট্টার নেশার জন্য বন্ধু ল্যাংড়ার পয়সাও মাঝে মাঝে ঝেড়ে দিতাম। ও বুঝতে পারত কিন্তু কিছু বলত না।

ত্রিসংসারে ল্যাংড়ার একমাত্র ভালবাসার লোক ও আপনজন ছিলাম আমি। অথচ যখন ল্যাংড়া মারা গেল গাড়ির ধাক্কায়, তখন ঝামেলা এড়াতে ওর বডি রাস্তাতেই ফেলে রেখে আমি পালিয়ে গেছিলাম। অবশ্য পালাবার আগে ওর বডির কাছে পড়ে থাকা পয়সার কৌটোটা হাতিয়ে নিতে ভুল হয়নি।

আচ্ছা আমি যেমন মরে গিয়েও সব কিছু দেখতে পাচ্ছি তেমনি ওইদিন ল্যাংড়াও নিশ্চয় দেখেছিল যে আমি ওর বডি রাস্তায় ফেলে রেখে পয়সার কৌটো হাতিয়ে পালাচ্ছি। ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জা!

আমি আমার সারা জীবনে কখনও লাজ লজ্জার ধার ধারিনি। শুধুমাত্র নিজের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি। সেই আমারও আজ পুরানো কথা মনে পড়াতে লজ্জা করতে লাগল। ভালই হয়েছে আমি মরে গেছি। কি লাভ ওভাবে রাস্তার কুকুর বেড়ালের মত বেঁচে থেকে?

শুধু যদি ল্যাংড়ার জন্যে কিছু একটা করতে পারতাম তাহলে আর আপসোস থাকত না কোনও। ও আমার জন্যে অনেক করেছে। আমাকে নানা ভাবে কাঁদুনি গেয়ে ভিক্ষা করতে শিখিয়েছিল। কোনোদিন রোজগার না হলেও নিজের খাবার থেকে ভাগ দিত। ওর পয়সা চুরি করলেও কখনও কিছু বলেনি। আমি যখন চুল্লুর নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়তাম, তখন আমার ভিক্ষার পয়সা ওই সামলে রাখত। আর আমি তার বদলে...

(৫)

হঠাৎই দেখি যে রাস্তার ওদিকের ছোকরা ভিখারিটা এদিকে আসছে। এদিকে এসেই একেবারে ঝাঁপ দিয়ে আমার বডির উপরে পড়ে, ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে, "বাপু, বাপু, তুম হামকো ছোড়কে কঁহা চলে গয়ে... বাপু আঁখে খোলো, বাপু, মেরি তরফ দেখো..."

ছোকরার এই ডুকরে কেঁদে ওঠা দেখে গার্ড দুটো জিজ্ঞেস করে , "এই ছোকরা কাঁদছিস কেন? এই বুড়ঢা তোর কে?"

ছোকরা তেমনি ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠে, "বাবুজি, ইনি আমার পিতাজি, মুঝে অকেলা ছোড়কে মত যাইয়ে পিতাজি,"

এই ছোকরাকে আমি চিনি। ভীষণ সেয়ানা আর বজ্জাত, একেবারে চালু মাল। পাশের এলাকায় ভিক্ষা করে। মাঝে মাঝে এদিকেও চলে আসে। ল্যাংড়া ওকে একদম দেখতে পারত না।

কিন্তু ব্যাটা আমার বডি জড়িয়ে ধরে পিতাজি পিতাজি বলে কাঁদছে কেন? আমি আবার ওর পিতাজি হলাম কবে? যাকগে, দেখাই যাক ব্যাটার মতলবটা কি।

এর মধ্যে ছোকরার কান্না শুনে একটা ছোটখাট ভিড় জমে যায়। নানা জনের নানা রকম মন্তব্য কানে আসে।

"কেন যে সরকার এই ভিখারিদের এগেনস্টে স্টেপ নেয় না বুঝি না।"

"রাজধানীর কলঙ্ক হল এই ভিখারিরা।"

"মালুম নেহি, পুলিশ লাথ মারকে ইন ভিখারিয়োঁকো নিকাল কিঁউ নেহি দেতি।"

"ইন লোগোনে নিউ ইয়ারকা সত্যনাশ কর দিয়া। মুড অফ হো গিয়া বিলকুল।"

গন্ডোগোল শুনে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার ছুটে আসেন। মাথা ঠান্ডা মানুষ। বোঝেন, যে এই ঝামেলার আশু সমাধান করতে না পারলে একটু পরেই বড় ঝামেলায় পড়তে হবে।

তাছাড়া আজ নিউ-ইয়ার ইভ-এ অনেক নামী-দামী ক্লায়েন্টরা টেবিল বুক করেছেন, আজ সারারাত নিউ ইয়ারের খানা-পিনা, নাচ-গান হবে। কিন্তু ঠিক রেস্টুরেন্টের গেটের সামনে এই দৃশ্য দেখলে, ক্লায়েন্টরা চটে গিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারেন, এছাড়াও ডেডবডি ওঠাতে পুলিশ আসতে পারে। আর পুলিশ আসা মানেই শতেক ঝামেলা। নিউ ইয়ার ইভের ক্লায়েন্টদের সামলাবেন না পুলিশের জেরায় জেরবার হবেন।

(৬)

ভিড় ঠেলে ম্যানেজার্ সামনে এগিয়ে আসেন। ছেলেটিকে বলেন, "অ্যাই, এরকম কাঁদছিস্ কেন? কি হয়েছে?"

"সাহেব, আমার পিতাজি স্বর্গবাসী হয়েছেন। ওঃ হো...হো...হো...।"

"দ্যাখ, তোর পিতাজি যখন মারাই গেছেন, তখন কাঁদলে তো আর পিতাজি ফেরত আসবেন না। এখন বরং পিতাজির শেষ ক্রিয়াকর্ম ভাল করে কর। শ্মশানে নিয়ে যা। এই নে পাঁচশ টাকা।" হাতে হাতে আরো কয়েকশ টাকা চাঁদা ওঠে। ছোকরা সব টাকাটা পকেটে পুরে, কান্না থামিয়ে একটা ঠেলা গাড়ি ভাড়া করে আনে। তাতে আমার বডি উঠিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে। ভিড়পাতলা হয়। ম্যানেজার মশাইও উটকো ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। আমিও কৌতূহলী হয়ে ঠেলার পেছন পেছন চলতে থাকি। ব্যাটা কি আমার বডি শ্মশানে নিয়ে যাবে? দেখা যাক।

ঠেলাওয়ালা আর ছোকরা খানিকক্ষণ নানা রাস্তায় চলার পর একটা বহুত বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। আমার মনে পড়ে যায় যে একবার আমি যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তখন অন্য আরেক ভিখারি ল্যাংড়াকে বলেছিল যে "ওকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাও। ওখানের হাসপাতালে মুফতে দাওয়াই পাওয়া যায়।"

তখন ল্যাংড়া খোঁজখবর করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। অবশ্য আমরা ভেতরে ঢুকতে পরিনি। কেননা গেটের দরোয়ানজি ল্যাংড়ার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিল। ল্যাংড়ার কাছে তখন টাকা ছিল না। তাই দরোয়ানজি ওকে আর জ্বরে প্রায় বেহুঁশ আমাকে দু'ঘা ডাণ্ডা মেরে ভাগিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য আমার মতো ভিখারিদের জান খুব কড়া। তাই বিনা দাওয়াইতেই কয়েকদিন পর চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম।

এই সেই মেডিকেল কলেজ, কিন্তু ওই ছোকরা আমার বডি ঠেলায় চাপিয়ে এখানে নিয়ে এলো কেন? ঠেলাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে ছোকরা ভেতরে চলে যায়।খানিকক্ষণ পর একজন লোককে নিয়ে ফেরত আসে। লোকটা আমার বডি দেখে, তারপর ফিসফিস করে দু'জনের কিছু কথা হয়। পকেট থেকে বেশ কিছু নোট বার করে লোকটা ছোকরার হাতে দেয়। তারপর ঠেলাওয়ালাকে কিছু বলে। সেই লোকটিও ঠেলাসহ ঠেলাওয়ালা মেডিকেল কলেজের ভেতরে চলে যায়।

আমি বুঝতে চেষ্টা করি যে ব্যাপারটা ঠিক কি হল।

(৭)

ওঃ হো….তাইতো….হঠাৎ আমার মনে পড়ে যে একবার একজন বলেছিল বটে যে এই মেডিকেল কলেজে বেওয়ারিশ লাশদের বিক্রি করা যায়।

ওখানে যারা পড়ালেখা করে, তাদের নাকি লাশ কাটতে হয়, হাড়-গোড় নিয়ে কাজকর্ম করতে হয়। তাই এখানের কিছু লোক বেওয়ারিশ লাশ কিনে তাদের হাড়-গোড় বার করে। যারা পড়ালেখা করে, তাদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করে। ছোকরা তাদের কাছে আমার বডিটাও বিক্রি করে দিয়েছে।

আমার এসব কথা ভাবতে ভাবতেই ছোকরা একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে টাকাগুলো গুনতে শুরু করেছে।

আমি ছোকরার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, শুনি ছোকরা নিজের মনেই বলছে,"বাঃ বাঃ আমার কপাল দেখছি খুবই ভালো, নতুন বছরের শুরুটা ভালোভাবেই হল। এই জায়গায় বেশ কিছুদিন ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করা যাবে।" ব্যাটার মুখ দেখি আনন্দে চকচক করছে।

এই সময়ে মেডিকেল কলেজের গেটের বাইরে লাগানো বড় ঘড়িটা ঢং ঢং করে বাজতে শুরু করে। দূর থেকে বহু লোকের হই-চই ও বাজি পটকার আওয়াজ ভেসে আসে। এসে পড়েছে নতুন বছর। এই প্রথমবার আমার নতুন বছরকে ভাল লাগে। আমিও তাহলে কিছু লোককে খুশি করতে পেরেছি। কিছু লোককে আনন্দ দিতে পেরেছি।

ওই ছোকরা, ওই আমার বডি কেনা লোকটি, যে সব পড়নেওয়ালারা আমার হাড়গোড়গুলো নিয়ে পড়বে- এদের সবার খুশির কারণ আমি। তা হোক না সে আমার মরার পরেই, আমারও কিছু দাম আছে তাহলে। বাহবা দিতে হয় ওই ছোকরাকে। কেননা ওই প্রথম এটা বুঝতে পেরেছিল। খানিকক্ষণ আগেই একমাত্র বন্ধু ল্যাংড়ার জন্য কখনও কিছু করতে না পারার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছিল, লজ্জা হচ্ছিল; কিন্তু অন্যদিকে আবার এত লোককে খুশি করতে পেরেছি, এই ভেবে আমি হঠাৎই যেন অনুভব করলাম যে এই নতুন বছরের প্রথম দিনে সেই লজ্জা ও দুঃখের বোঝাটা ধীরে ধীরে গলে যেন হালকা হয়ে যাচ্ছে।

কণাদ এবং.....

তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে
গিয়ে এগুলোকে খেতে হবে! আহা!
যাহ!
আরিববাস!
হায়
হায়
হায় হায় রে......!

হমমমম... তবে...!
পেয়েছি!
হেঁ হেঁ ...
এটা চলে..
বা এটা
থেমে থাকে !
বুঝেছি!
??
কে রে বাবা,
পাগল নাকি?!
হুঁ হুঁ বাবা....

এইয়ে মশাই!
যাহবাওআ !
বুঝলেন তো??
আপনি বললেন আপনার রসগোল্লা নাকি ছোট ছোট কলা দিয়ে তৈরী- আর সেই কলা+কলা দিয়ে তৈরী রসগোল্লা-টা আপনি খেতেন!
তার মানে---- .....!!
কলা খায় কলা খায় !!
আপনি কলা খান!
কলারাক্ষস !
কলাদ! কলাদ!
কলাদ, কলারাক্ষস
কলা খায়......... ছিঃ!
বোকা কোথাকার একটা!

বাড়ি ফিরে.....
ইয়ে না- মানে...--
কি হলটা কি?
কি-ই-ই-ই!
মানে আসলে
বাটিটা পরে গেসল--
তাই.........না তবে
এই একখানা আস্ত আছে!
কিন্তু আমি এদিকে-
যাচ্ছলে,
আমি এদিকে একটা
নতুন ভাবনা ভেবেছি!
কত কষ্ট করে
পয়সা যোগাড় করে
ওটা আনতে দিয়েছিলাম--
আর তুমি কিনা----!!!
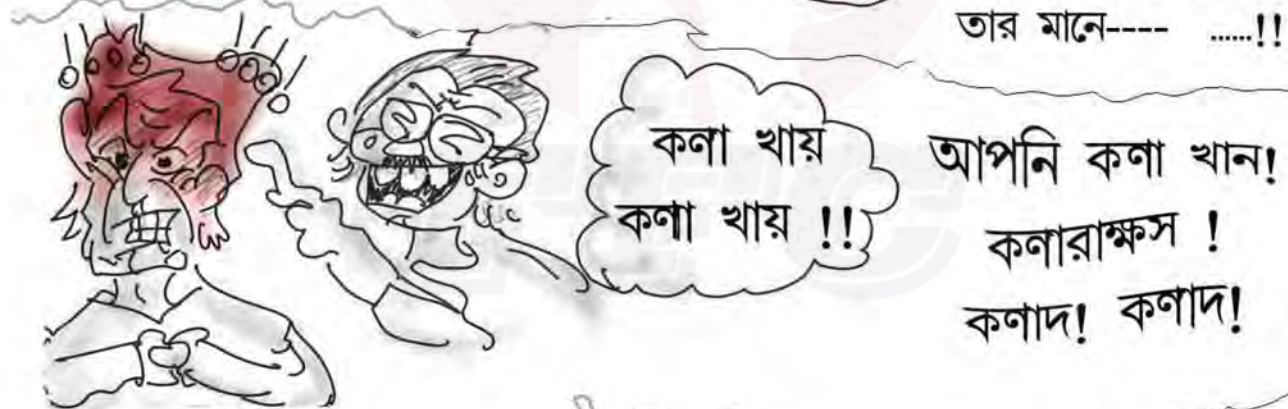
আজকে তুমি খাবার পাবেনা--
যেদিকে দু-চোখ যায় যেতে পারো!
যাহবাবা ....
আচচাহ্, তাই সই.... !

বাড়ি থেকে বেরিয়ে হঠাৎ....
হায় হায় হায় রে ভগবান!
হায় রে হে ভগবান --
আমাকে অর্থ দাও --
তুমি-ই তো সব চালাও--
তুমি-ই সর্বশক্তিমান......
হমমমম...
তাহলে, বুঝলুম!
এই অণু-টা,
ঠিক করে দাঁড়া !
পেয়ে গেছি!

বাহ!
তবে হল শেষ অবধি.....
কনাদ লিখলেন.....
অণু-রা কত কি করতে পারে!

কনাদ গত হওয়ার অনেক পরে, গ্রীস দেশে --
যত্তসব!
ঠিক, ঠিক বলেছেন ডেমোক্রিটাস, আমি একমত আপনার সাথে! তা এই কনা-দের বলা যাক অ্যাটোমোস... !
সব বস্তু-ই ছোট ছোট কনা দিয়ে তৈরী- বুঝলে লিউসিপাস ? আর আমরাই কিন্তু প্রথম এটা নিয়ে কথা বললাম-ভাবলাম, তাই তো?
USE ME
ওমা !
কেরে বাবা!
তোরা কি নিয়ে কথা বলছিস রে?
খবরদার!
ট্রালালালালা.....
বাবাগো!
হায়রে.. মাগো !
হাহাহাহাহাহাহাহাহ---!!
অণু!
আজ তোদেরকে আমি সত্যিকারের কনা-য় পরিণত করব!
পালাও পালাও !!

এই ছিলেন কণাদ,
এর অনেক পরে
এনি খুব বিখ্যাত হবেন।
তিনি দার্শনিক --
বৈশেষিক এর কণাদ---
তিনি-ই হয়তো প্রথম
"অ্যাটম" এর কথা বলেন--
তবে---

পরমাণু-র অপব্যাবহার এ,
কণাদ দুঃখ এবং ভয়--
দুই-ই পেয়েছিলেন.................

ক্যামেরা

শিবাদিত্য দাশশর্মা

থাকত যদি আমার দুচোখে একটা ক্যামেরা,
নিতাম লুটে চেনা অচেনা মুহূর্ত..
বন্দী হতো হাজারটা উড়ো স্বপ্ন,
বন্দী হতো খোলা আকাশের কোনে একটুখানি মেঘ,
বন্দী হতো আমার রক্ত মাখা শহরের সূর্যাস্ত !!
থাকত যদি আমার দুচোখে একটা ক্যামেরা,
তবে ফোকাস হতো লোকাল বাসের ঘাম ঝরা সত্যি
আর মিডল ক্লাসের মাস শেষে মিনার চিন্তা।
নিতাম হয়ত বন্দী করে বাইপাস আর ধর্মতলায় স্ট্রীট লাইটের সারি
তবু দেখতে পেতাম অন্ধকারে বাস করে কিছু গৃহহীন নর-নারী !!.....

থাকত যদি আমার দুচোখে একটা ক্যামেরা,
তবে বন্দী হতো ঢাকের তালে মা দুর্গার আগমনী...
তবে ঝাপসা লেন্সের মধ্যে দিয়ে রেকর্ড হতো
রোজ রাতে পাড়া-মাতালের মাতলামি...
আর বন্দী হতো আমার শহর আমার ক্যামেরাতে।
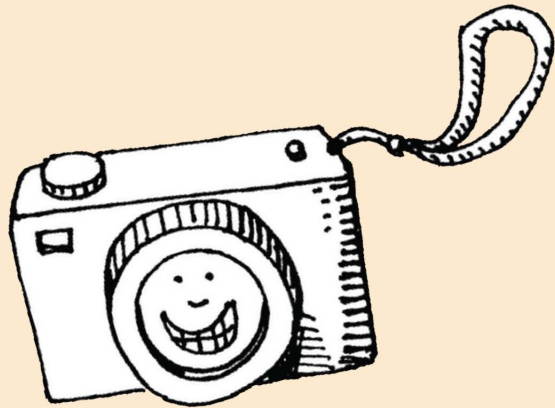
BIB_MAZ PHOTOGRAPHY
কৃষ্ণাঙ্গ পায়রা
বিভাস মজুমদার
ছুটন্ত
শুভঙ্কর ঘোষ
সোনালী বিশাখাপত্তনম
শুভঙ্কর ঘোষ

গল্প
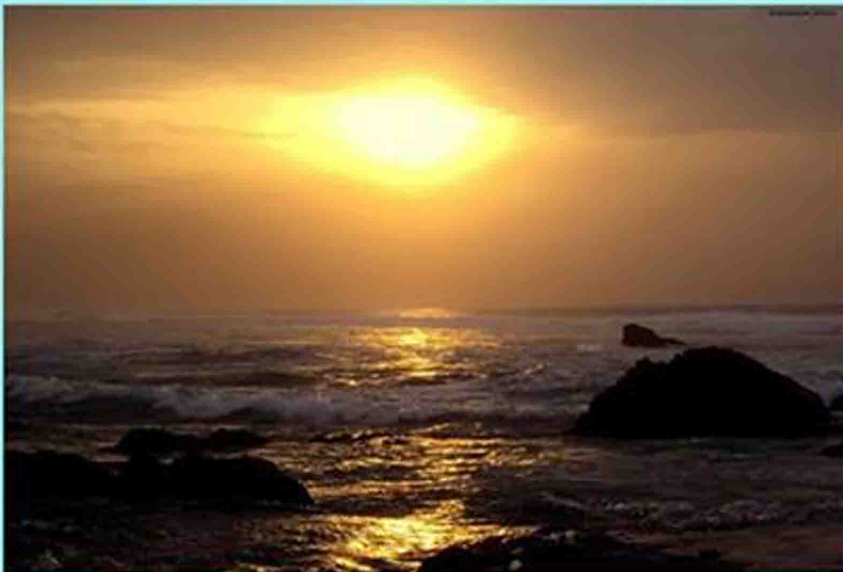
স্কুলের মাঠের এই দিকটায় বসে টিফিন খেতে ভালবাসে শ্রাবনিকা । শহরের একটা নামী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ৮ বছরের ছোট্ট শ্রাবনিকা । মাঠের এদিকের তারের বেড়াটা ফাটা। ওখান দিয়ে রাস্তার লোক দেখতে দেখতে ও টিফিন খায়। ওর শিশু মন এক অনাবিল আনন্দে ভরে ওঠে। আজ অন্যদিনের মত ও এইখানে বসে টিফিন খাচ্ছে । সেই সময় এক অচেনা কণ্ঠস্বর ওর কানে এলো।

-"আমায় কিছু খেতে দেবে?"।

এক অচেনা কণ্ঠ শুনে ঘুরে তাকালো শ্রাবনিকা। দেখল ফাটা তারের ওখান দিয়ে একটা ছেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। গায়ে ময়লা ছেঁড়া জামা।

-"কে তুমি? কি চাই?" শ্রাবনিকা ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলো।

-"আমায় কিছু খেতে দেবে? আমি রোজ তোমায় দেখি এখানে বসে খাও। আমি আর আমার দুই বোন কিছু খাইনি সেই সকাল থেকে। শ্রাবনিকা একটু ভেবে ওর আনা কলা আর আপেলটা দিয়ে দিল ছেলে টাকে বলল,

-"এই নাও। তুমি কোথায় থাক? সকাল থেকে খাওনি কেন?"

-"আমরা ওই দিকে একটা ফুটপাথ-এ থাকি। আমার বাবা সকালে বেরিয়ে যায়, রাতে আসে। সব দিন খাবার আনতে পারেনা। যেদিন আনে খাই।তুমি খুব ভালো"

-"এরা কি তোমার বোন?"

ছেলেটার সাথে থাকা দু'জন মেয়েকে দেখিয়ে শ্রাবনিকা জানতে চাইল।

-"হ্যাঁ"

-"তোমার নাম কি?"

-"আমার নাম দীপু। এ আমার বোন রিনি আর এ রুপু"

-"তোমরা স্কুলে পড়না?"

-"না"

-"কেন?"

-"আমাদের তো পড়ার টাকা নেই"

-"তোমরা রোজ এই সময়ে এখানে এসো৷ আমি তোমাদের জন্য বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসব৷"

-"তোমার বাড়িতে তোমার মা বকবে না?"

-"মাকে বলব না"

এমন সময় বিদ্যালয়ের টিফিন বিরতি শেষের ঘন্টা বেজে গেল৷

-"আচ্ছা আমি এখন যাই৷ আবার ক্লাস শুরু হবে৷ তোমরা এখানে আর দাঁড়িও না৷ কেউ দেখতে পেলে বকবে৷ আর কাল আমায় এখানে দেখলে তবেই এখানে এসো, কেমন?"

দীপু ঘাড় নাড়ল৷ শ্রাবনিকা টিফিন বাক্স বাঁধা করে স্কুলের ভেতরে চলে গেল৷

ফলগুলো নিয়ে দীপু চলে এলো ফুটপাথের পিছনে ভাঙ্গা পাঁচিলটার কছে৷ ওখানে তিন ভাই বোনে মিলে ফল গুলো খেল আর কিছু মায়ের জন্য নিয়ে এলো৷ দীপু জানে ওর মাও সকাল থেকে কিছু খায়নি৷

স্কুল ছুটির ঘন্টা বেজে গেল৷ শ্রাবনিকা ক্লাস থেকে বেরিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এলো৷ অন্যদিন ওর চোখ ওর মা -কেই খোঁজে৷ আজ ওর চোখ বোধহয় অন্য কারোকে খুঁজছে৷ ওর ভাবতে খারাপ লাগছে ওর মত তিনটে ছেলে মেয়ে খাবার পায়না আর ওর বাড়িতে ফ্রীজে ভর্তি কত খাবার৷

-কিরে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? মায়ের গলা শুনে চমকে উঠল ও৷

-এমনি, তুমি এতো দেরী করলে কেন৷

-আর বলিস না, গাড়িতে তেল ভরতে দেরী হয়ে গেল রে, চল, খুব খিদে পেয়েছে না?

-মা, কাল থেকে আমাকে বেশি করে টিফিন দেবেতো৷ খুব খিদে পায়৷

-বেশ তো, তাই দেবো৷

বাড়ি ফিরে এসে শ্রাবনিকা শুধুই ভাবে দীপুর কথা, ওর বোনগুলোর করুণ মুখ ওর মনে পড়তে লাগলো৷ বই নিয়ে বসতে আর ভালো লাগলো না৷ ওর শিশু মন ঘিরে নানা প্রশ্ন উঁকি মারতে লাগলো৷

মা-এর কাছে ছোট্ট শ্রাবনিকা প্রশ্না করলো,

-আচ্ছা মা আমরা এতো বড় বাড়িতে থাকি, তাহলে সবার কেন থাকার বাড়ি নেই?

মা তো মেয়ের প্রশ্না শুনে অবাক৷ ও বলে কি, মা বলেন , -তোর মাথায় এমন প্রশ্ন এলো কি করে? কে জিজ্ঞেস করেছে এটা?

-কেউ করেনি, আমি এমনি বললাম৷ আমার স্কুল -এর ওখানে কটা আমার মতো মেয়ে কে দেখি ফুটপাথে শুয়ে আছে৷

-ওদের অন্য জায়গায় বাড়ি আছে৷ সেখানে অনেক অসুবিধা তাই এখানে আছে৷ তুমি বড় হলে বুঝবে৷

এরপর মাস খানেক কেটে গেছে৷ মাঝে মাঝেই স্কুলের টিফিন টাইমে দীপু আসে শ্রাবনিকার কাছে৷ শ্রাবনিকা তার টিফিন বাক্স থেকে নানা খাবার দীপুর হাতে তুলে দেয়৷ ওর খুব ভালো লাগে৷ গরমের ছুটির সময় এসে গেল৷ ও ভাবলো দীপুকে তো তখন ও খাবার দিতে পারবেনা৷ স্কুল ছুটি পড়ার সময় দীপুকে সে কথা বলল শ্রাবনিকা৷ ওর কথা শুনে দীপু ম্লান হাসলো৷ সে হাসির অর্থ বোঝার মতো বয়স অবশ্য এখান হয়নি শ্রাবনিকার৷ ও ছুটির আনন্দ গায়ে মেখে বাড়ি ফিরে এলো৷

একমাসের গরমের ছুটি শেষ হয়ে স্কুল আবার খুলেছে৷ শ্রাবনিকা আবার ওর সেই প্রিয় জায়গায় বসেছে টিফিন খেতে৷ আজ একমাস দীপু ও তার বোনদের সাথে দেখা হয়নি বলে আজ ও বাবার দেওয়া চকলেটের বাক্স গুলো সাথে নিয়ে এসেছে৷ কিন্তু যার জন্য আনা সেই দীপু কোই?? টিফিনের সময় প্রায়

শেষ হয়ে গেল , তবুও দীপুর আসার নাম নেই। ওর ভারী ভাবনা হলো ,তাহলে দীপু আর ওর বোনেরা কি ওর ওপর রাগ করেছে। অবশেষে টিফিন শেষের ঘন্টা বেজে গেল। অপেক্ষা করতে করতে ওর আর টিফিন খাওয়াই হলনা।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল , দীপু আর এলোনা। ওর বোনেরাও এলোনা। শ্রাবনিকার মনটা খারাপ হয়ে গেল ওদের জন্য।

একদিন শ্রাবনিকার মা ওকে জিজ্ঞেস করলেন, -কিরে তোর টিফিন সব পরে থাকে কেন রে? খাস না কেন? শরীর খারাপ নাকি?

-না, এমনি।

-ঠিক করে বল।

ছোট্ট শ্রাবনিকা চুপ করে রইল। কি বলবে মাকে ও বুঝতে পারলনা।

-কিরে কি হলো? চুপ করে আছিস কেন?

মা ধমক দিয়ে বললেন।

শ্রাবনিকা ভয়ে কেঁদে ফেলল. কাঁদতে কাঁদতে বলল,

-আমার স্কুলের ওখানে একটা ছেলে আর ওর বোনেরা খাবার চাইতে আসতো। আমি ওদেরকে খাবার দেবো বলে তোমাকে বেশী করে খাবার দিতে বলেছিলাম। ওরা আর আসেনা।

-কেন অচেনা কারোকে খাবার দিয়েছিস? তোকে বারণ করেছি না।

শ্রাবনিকা তখনও কেঁদে যাচ্ছে। মা রাগ করে চলে গেল।

-মা,ও মা।

চোখের জল মুছে কিছুক্ষণ পর, শ্রাবনিকা ডাকলো মাকে।

-কি হয়েছে? বল।

-কাল একবার স্কুল থেকে ফেরার সময় ওদের খুঁজতে যাবে? ওরা ওখানেই থাকে।

-না , আমি কোথাও যাবোনা।

-একবার চলনা মা, ও মা।

-বেশ, যাবো।তবে তুই বল আর এভাবে অচেনা কারোকে খাবার দিবিনা।

-আচ্ছা ঠিক আছে মনে থাকবে।

পরেরদিন শ্রাবনিকা রোজকারের মতোই স্কুলে গেছে। কিন্তু কিছুতেই তার মন পড়ায় বসছে না। ভারি উতলা লাগছে ওর , ও শুধু ভাবছে আজ দীপু কে যদি খুঁজে না পায়। যদি দেখা না হয় তার বোনগুলোর সাথে। দেখতে দেখতে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। আজ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো ও। প্রধান ফটকের সামনে এসে মা-কে খুঁজতে লাগলো ওর ছোট্ট সেই সরল নিষ্পাপ চোখ দুটো।

শ্রাবনিকার মা এগিয়ে এলেন মেয়ের কাছে। মেয়ের হাত ধরে স্কুলের পাশের ফুটপাথের দিকে হাঁটতে লাগলেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে কিছু খুব পুরনো ভাঙ্গা ঝুপড়ি চোখে পড়ল। ওখানে গিয়ে একজন বয়স্কা মহিলাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন , -"এখানে দীপু বলে কেউ থাকে? ওর আরো দুটো বোন আছে"

-বুড়ি একটু অবাক চোখে তাকাল শ্রাবনিকার মায়ের দিকে । এখানে ওর মাসি থাকে। ও ওই দিকে একটা বস্তিতে থাকে। তা তোমরা কে? ওকে কেন খুঁজছে?

-না ওর জন্য কিছু খাবার এনেছি।

এই কথা শুনে বুড়ি অঞ্চল দিয়ে চোখ মুছতে আরাম্ভো করলেন। তারপর টিপু নাম একটা ছেলেকে ডাকলেন। ডাক শুনেই টিপু চলে এলো। ওকে দেখে বুড়ি বলল - "এদের শিউলি মাসির বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়না। এরা দীপুকে খুঁজছে। ছেলেটার সাথে শ্রাবনিকা আর ওর মা হাঁটতে লাগলো। কিছু দূর গিয়ে একটা রাস্তার মোর

ঘুরে একটা বস্তিতে এসে পৌঁছল ওরা। ওখানে গিয়ে টিপু জোরে চেঁচাতে লাগলো,

-ও শিউলি মাসি। দীপুকে কারা খুঁজছে।

কিছুক্ষণ বাদে বস্তির একটা ঘর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে আসলো। সাথে দুটো ছোট মেয়ে। শ্রাবনিকা ওদের চিনতে পারল। রুপুকে দেখে হাসলো শ্রাবনিকা।

রুপুর অবাক চাহনি দেখে মনে হলো ও যেন শ্রাবনিকা কে ঠিক চিনতে পারলনা। মহিলা শ্রাবনিকার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল,

-আপনাকে তো চিনলামনা।

-আমার মেয়ের কাছে দীপু রোজ যেত ওর টিফিন টাইমে। দীপু আর ওর বোনেদের আমার মেয়ে রোজ খাবার দিত। দীপু আর আসছেনা বলে ও বলল দীপুকে খুঁজে দেখতে। তাই মেয়ের আবদার মেটাতে আমার এখানে আসা।

দীপুর মা একটু চুপ করে থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মহিলা যা বলল তা শুনে শ্রাবনিকার মায়ের মন তাও মোচর দিয়ে উঠল। অচেনা একটা ছেলের জন্য তার বুকেও ব্যথাগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল।

মহিলা বলল, -আর কি বলব দিদি, সবই আমার কপাল। কয়েক সপ্তাহ হলো , বৃষ্টিতে ভিজে খুব জ্বরে পরেছিল ছেলেটা। ডাক্তার দেখল ওষুধ দিল , কিন্তু ভাগ্য কি বদলায়!

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, তিন দিনের জ্বরে নিয়ে চলে গেল আমার ছেলেটাকে।

শ্রাবনিকার মায়ের চোখ তাও অশ্রু ঘন হয়ে উঠেছে। শ্রাবনিকা কি বুঝলো ওই জানে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো নিজের মায়ের দিকে আর দীপুর মায়ের দিকে। দীপু আর ওর বোনেদের জন্য আনা খাবারগুলো তিনি দীপুর মায়ের হাতে তুলে দিলেন। আর দিলেন একটা পাঁচশ টাকার নোট।

এইটুকুতে ওদের দুঃখ-বেদনা কিছুই মোছা যাবে না সেটা তিনি জানেন। তবুও একটা ছোট্ট চেষ্টা কারোর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে মুখে একটু হাসি আনার। মেয়েকে নিয়ে চলে আসার সময় শ্রাবনিকার মা লক্ষ্য করলেন , দীপুর মাকে, আর মনে মনে ভাবলেন মানুষের ভাগ্যের কিছু ভুল তাকে কোথায় নিয়ে এসে দাঁড় করায়। রাস্তা পেরিয়ে বাঁক নেবার মুখে শ্রাবনিকা পিছন ফিরে তাকালো, দীপুর বোনেদের দিকে তাকিয়ে ওর ছোট্ট হাতটা নাড়ালো, যেন সমুদ্র সমান বেদনার মাঝে এক মুঠো ভরসা।

ফেলুদা স্পেশাল

তোপসে ফেলুদার টেলি যোগাযোগ

বিশেষ অতিথি কবি উদয়ন ঘোষ

" হ্যালো, আমি তোপসে বলছি, শুনছ তো ফেলুদা?

জল আর জলাশয়গুলির অন্তর্ধান রহস্য, তুমি ভেদ করার দায়িত্ব দিয়েছ, আমি এর রহস্যহীনতা দেখে হতবাক হয়ে বসে আছি।

কোথায় রহস্য? আর জাদুকর কারা?

ওই যে অজগর সব গিলে খাচ্ছে শোনা গিয়েছিল, তাকে তো চোখের সামনে সবাই দেখেছে।

শিলচরের মালিনী বিল, পশ্চিম বাংলার সব জলাশয় ও নদী,

ভারতবর্ষের সব কলকলানো শিরা উপশিরা

ছিঁড়েছে, চিবোচ্ছে, গিলছে যারা।

তারা টাইরোনোসরাস রেক্সরা কোন কল্পবিজ্ঞানের কোন জুরাসিক পার্ক থেকে আসা।

এদের তো চারিদিকে বাস্তববিধি বন্দোবস্ত খাসা।

দেশজুড়ে বিস্তীর্ন আশকারা।"

২

"তোপসে শোন, ফেলুদা বলছি, রহস্য গভীর।

যে দৃশ্য দেখছিস তার পেছনে অদৃশ্য অন্য এক দৃশ্যাবলি কাজ করছে,

ঠিক যেরকম ডাক মাষ্টারের এক অদৃষ্ট জগৎ এই মহাবিশ্বে বিস্তৃত রয়েছে

যার চালচলন গতিবিধি নিয়মকানুন কেউ বুঝতেই পারছে না।

হেগেলের ইউনিট অফ অপোজিটস নিশ্চয়ই জানিস?

শুনেছিস কলকাতায় এখনও কিছু ফুল ফোটে রাস্তার ধারে?

কলকাতায় যে এখনও কিছু মানুষের বসবাস আছে?

তাঁর প্রমাণ, এখানে কিছু মানুষকে প্রাণ দিতে দেখা গেছে,

জলাশয় বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে।

কলকাতায় কিছু কিছু ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেছে,

'কারা গাছ কেটে হোর্ডিং লাগাচ্ছে? কোন শালা? '

তুই তো কাগজ পড়ে সেদিন শোনালি

'এক অতি সাধারণ ইস্কুল মাষ্টার

অনেক বিলুপ্তপ্রায় মাছদের রক্ষা করতে গিয়ে,

তিল তিল করে তাঁর সমস্ত জমানো

সারাজীবনের পুঁজি গ্রামের এক পুকুরে ঢেলেছে।

মুগ্ধ সুরসিক সব গ্রামবাসী ওই পুকুরকে বলছে "তিলোত্তমা"।

বত্রিশটা দাঁতের মধ্যে সুকোমল জিভের মতন

এসব মানুষ আজও কি করে রয়েছে

সে খবর বের করতেই শার্লক হোমস্, তোকে পাঠিয়েছি।

গঙ্গা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, তিতাস

এসকল মানুষের হৃদ-যন্ত্র থেকে হয়তো অক্সিজেন পেতে পারে।

এসব নদীর নাভিশ্বাস তুই ঠিকই দেখেছিস।

আর ওই অজগর ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে।

তবু হেগেলের সুত্র ধরে স্পারটাকাস উঠে আসবে,

রয়ে যাবে স্বচ্ছতোয়া নদী।।"
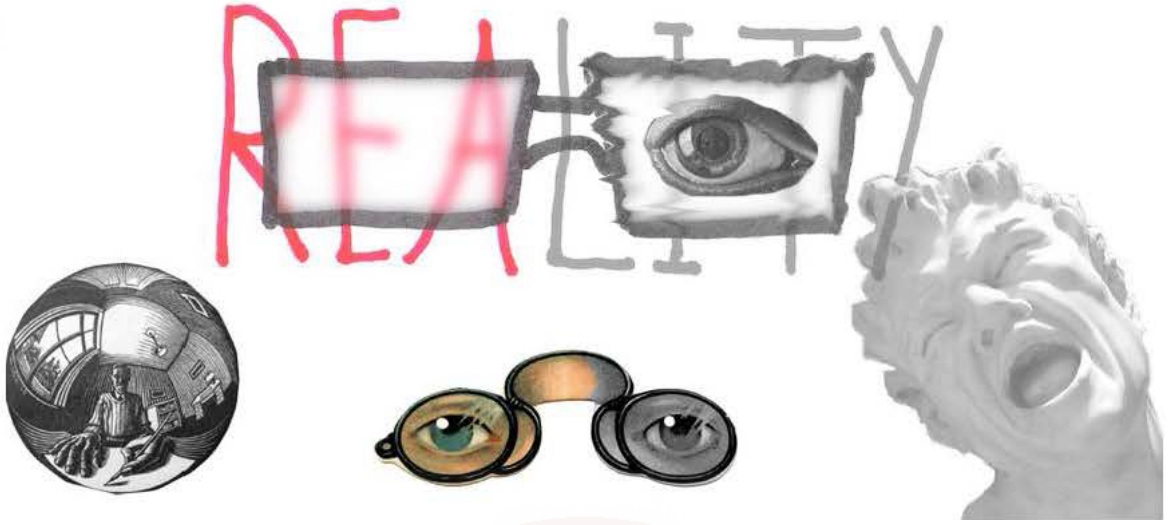
শেষ ট্রেন

আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রের শেষ ট্রেনটা নিশিকান্তবাবুকে ছেড়ে চলে গেল। এখন রাত ১১ টা। ১২ টার আগে বাড়ি ঢুকতে পারবেন কি? হয়ত না... সেই ৬ ক্রোশ পথ এই একটা চটি পরে যেতে হবে..এখনও এখানে বিজলি আলো এসে পৌঁছায়নি .... কেন এত পিছিয়ে (পিছোয় কিকরে) তাদের এই গ্রাম? একসময় এইখানকার সেই "বয়েজ স্কুল"-এ বাংলা পড়াতেন...এখন সেখানে একটা আস্ত বাড়ি উঠে গেছে...তবে স্কুলটা ছিল স্টেশনের গা ঘেঁষে..অর্থাৎ যেখানে তিনি এখন রয়েছেন তার একটু পাশেই.. স্টেশন এর নাম "শশীনগর"...তাদের গ্রামটা অনেকটা ভিতরে--- সেখানে কিচ্ছুটি নেই..কে আছে তার বাড়িতে? বউ তো কবে মারা গেছেন... কিভাবে......কিভাবে---- নাহ মনে পরে নাহ...একটা ছেলে ছিল..সেও যেন কোথায় চলে গেল একদিন তার বাবার সাথে ঝগড়া করে ... নাকি বাহাত্তরের নকশাল আন্দোলনে গুলি খেয়ে......নাকি নাকি... স্বাধীনতার সশস্ত্র আন্দোলন করতে গিয়ে সেই, সেই... নাহ..মনে নেই.... আর একটা মেয়ে- ও ছিল কি? হয়ত ছিল...থাকলে সেই মেয়েটাও আর বেঁচে নেই...একদিন/ একরাত-এ মারা গেছিল...কিভাবে? কারা যেন তাকে জোর করে জোর করে-ই —আর

ভাবতে পারলেন না তিনি... উফফ... ! মেয়েটা যে কিরম ভাবে চলে গেল, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয় (গায়ে কাঁটা কোথায় ?) ...মেয়েকে তিনি ভালবাসতেন...এখন-ও বাসেন...তবে লুকিয়ে...... কারন মেয়ে জানে না... জানবেও না...

তবে এখন হয়ত নিশিবাবু থাকেন একলা... কেউ নেই..কিচ্ছু করেন না... যা টাকা জমানো ছিল, তাই দিয়েই চলে কোনোমতে, কষ্টে-সৃষ্টে৷ এখন স্টেশনে কেন এসেছিলেন? কিজানি..এখন মনে পড়ছে না, পরে মনে পড়বে, নাও মনে পড়তে পারে..এখন সবি কেমন ভুলে-ভুলে যান... তার নাতি-নাতনি কোথায়? আছে কি? না নেই... একা..একা...এই কথাটা বড্ড কষ্ট দেয় তাকে..কি-ই বা করবেন..থাকেন কোথায়? একটা বাড়ি? নাকি কুঁড়েঘর? যতদুর মনে পরে একটা আম-কাঁঠালের বাগান..একটা খেজুর গাছ..একটা কল-তলা..নানা, সেসব তো ছোটবেলায় থাকতেন...এখন থাকেন যেখানে..না মনে পড়ছে না.. ভাবতে হবে..একদিন একজন ডাক্তারকে দেখাতে গিয়েছিলেন..তিনি একা--- নানা--কে যেন নিয়ে গেসলো বেশ..মনে পড়ে না..সবই আবছা আবছা... তাও নয়...পরিষ্কারও আছে..যেমন ছোটবেলায় তার একবার টাইফয়েড হয়েছিল.. প্রাণ নিয়ে টানাটানি..শেষে--শেষে--না মনে নেই... এখন যেন-- হ্যাঁ, তার মাথার গন্ডগোল দেখা দিয়েছে..হয়ত পাগল হয়ে গেছেন, বা যাবেন..বা মাঝামাঝি! তা কে যেন সঙ্গে করে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিল-- নাকি একাই গেসলেন-- যাক গে..সেই ডাক্তার তাকে কোথায় যেন যেতে বলেছিল..যাননি..ভুলে গেছেন.. ওষুধ দিয়েছিল অনেক..খাননি৷ নাকি খেয়েছিলেন? জানেন না..তাহলে কি আজ শেষ ট্রেনটাতেই ফিরতেন? নানা... হয়তো তার আগেই..আসার আগে... আচ্ছা ট্রেনটাতে চড়েছিলেন ঠিক কোথা থেকে? প্রতি স্টেশন এ নেমে নেমে হলুদ বোর্ডে লেখাটা পড়ে নিয়েছিলেন.. তাই আজ কি ভুল স্টেশনে নেমেছেন? এগিয়ে গিয়ে টর্চ দিয়ে একবার--দুবার- পড়ে দেখলেন..না , কোনো ভুল নেই.. সশিনগরই লেখা ... নাকি ওটা শশীনগর হতো? বানানটা ভুল কি? একটাই শশীনগর এই পৃথিবীতে? নাকি তিনি জানেন না বলে ভুল করছেন... ধুর ! হাল ছেড়ে দিয়ে পা বাড়ালেন..পিছনে একটা ট্রেন যাওয়ার শব্দ পেলেন কি? মনের ভুলও হতে পারে..এরকম উদ্ভট আওয়াজ কেন ট্রেনটার..? তিনি কি এখনও ট্রেন থেকে নামেননি? আবার উঠতে হবে? এটা কি স্বপ্ন দেখছেন? ধুর...! তিনি নিজের মনে নিজে নিজেই হাসলেন... কিসব উদ্ভট ভাবছেন.. পাগল হলেন নাকি! নাকি হয়ে-ই ছিলেন? নিশিবাবুর মনে আবার খটকা লাগলো... নাকি কোনও বিশেষ কারণে হয়েছিলেন? যে কারণে আজ এরম অবস্থা? নাও তো হতে পারে এরম অবস্থা??! কি হতে পারে তবে সত্যিকারের? সবকিছুই ধোঁয়াটে আবরণে এগিয়ে আসে/আসছে কেন তার কাছে? তিনি কি অন্ধ হলেন? না, কলকাতার বড় চোখের ডাক্তারকে কবে যেন দেখাতে গিয়েছিলেন.. তিনি বলেছিলেন ...তিনি বলেছেন--বলেছেন....না মনে নেই..ফালতু না ভেবে পা চালালে কাজে দেবে... এক পা এগোতেই আবার কি যেন মনে হলো নিশিবাবুর...পায়ে একটা ব্যথা না? কবে লাগল? ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে কি? নাকি কেউ তার পা মাড়িয়ে দিয়েছে তিনি বুঝতে পারেননি? একটা ঘটনার এত দিক ভাবতে ভাবতে.. নিশিবাবুর হঠাৎ মনে পড়ল একবার ছেলেবেলায় উঠোন থেকে পরে গিয়ে পা ভেঙ্গেছিল.. কিন্তু সে ব্যথা তো সেরে গিয়েছিল মলম লাগিয়ে? নাকি বড়ি খেয়েছিলেন? মলম নাকি বড়ি সে পরে ভাবা যাবে..এখন .. এখন এগোনো যাক--- কিন্তু খুব ব্যথা করছে পায়ের পাতায়..পা মুচকলো নাকি ভাঙ্গলো কে জানে! এত ব্যথা তো অনেকদিন পাননি পায়ে...ঠিক ভেঙ্গে

যাওয়ার সময় এরকম ব্যথা করছিল... তবে কি তিনি শৈশবেই আছেন? এই বড় হওয়া, শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরা.. বউ এর "কলেরা"(কলেরাই তো?) -য় মারা যাওয়া..ছেলেটার ঝগড়া করে চলে যাওয়া (কেন ঝগড়া?)..মেয়েটার, মেয়েটার..সেই , ; সেই.---সবই তবে স্বপ্ন ছিল? কিচ্ছু বুঝতে পারছেননা নিশিবাবু..সব গুলিয়ে একাকার হয়ে বারবার ওই শেষ ট্রেনটার ঘটঘট শব্দের মতন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে...নাকি ওই ঘটঘট শব্দের জন্যই তার এগুলো মনে আসছে? ট্রেনে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন? নানা হতে পারে না... গায়ে চিমটি কাটলেন..না সত্যি-র জগতে-ই আছেন তিনি..এই সত্যি-র জগতটা কেমন যেন... এত সত্যি, তবুও সবই একঘেয়ে... কই ! এত কথা ভাবতে ভাবতে আবার কখন হাঁটতে শুরু করেছেন..না মনেহয়..তিনি হয়তো কিছুই কথা ভাবেননি...তার মনের ভুল মাত্র..যাগ্গে... এবার আর পায়ে ব্যথা নেই...ঠিক হয়ে গেছে..তবে ভয় হয় , আবার যদি ব্যথাটা চাগার দ্যায়! কে নিয়ে যাবে তাকে ডাক্তার খানা? কে "কিনে" দেবে তার মত পাগল কে ওষুধপত্র?? মফঃস্বল শহর থেকে তিনি এগিয়ে চলেছেন গন্ড-গ্রামের দিকে..।কদ্দিন আছেন সেখানে? প্রায়—১০-১৫ (৫-বছর বাড়িয়ে ধরলাম কেন? ১০ এর পর ১২ বা ১৩- ও তো হতে পারত!) বছর..? নাকি তার বেশি? কি হবে তা দিয়ে..এখন তার লক্ষ্য বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে ঘুমুতে যাওয়া...অন্য কথা ভেবে মাথাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ? মাথাকে কষ্ট দিচ্ছেন? নাকি মাথা তাকে কষ্ট দিচ্ছে? কোনটাকে "ঠিক" বলে মেনে নেবেন এই সত্যি-র জগতে? মেনে-ই বা নেবেন কেন? ছোটবেলা থেকে মা-বাবা-র বকুনি মুখ পেতে সহ্য করেছেন..তারপর ছেলের বকুনি..মাথা পেতে গ্রহণ করাতেই ছেলে কি আর নেই? আর মেয়ে—ও... মাথা পেতে গ্রহণ --- ??! তার তখন থেকেই মাথার ব্যামো নয় তো?.. নানা, মাথার ব্যামোটা রাস্তার গুন্ডা-র হাতের ডান্ডা খেয়ে... কেন ডান্ডা খাবেন? কোনোদিন কি তার অত পয়সা ছিল যে ডাকাতরা তাকে লুঠ করতে আসবে? ছিলনা তো..তবে এরম ভাবলেন কেন ? তবে কি তার অনেক পয়সা ছিল, আদৌ তিনি কোনও ইস্কুলে পড়াতেন-টড়াতেন না, তিনি ছিলেন জমিদার..তারপর মাথায় ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে ডাকাত তার সর্বস্ব নিয়ে গেছে? কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? না না, সবই সম্ভব...নিশিবাবু হাঁটতে হাঁটতে মৃদু হাসলেন... টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে না? শেষ কবে শুনেছেন বৃষ্টির শব্দ? বাড়িতে বসে থাকতেন পা ভেঙ্গেছিলেন বলে... শুধুই শুনেছেন তাই জন্য..। দেখেছেন নিশ্চয়ই? বৃষ্টি সবাই দেখে? আজ বুঝছেন..শুনছেন না, দেখছেন না..শুদ্ধু বুঝছেন.....গায়ে অল্প অল্প ঠান্ডা জল পড়ছে... আগের দিন চান করেছিলেন? নাকি গা ধুয়েচিলেন? কে বলতে পারবে? কেউ কি আছে তার? না না.. কেউ নেই... তাই তো বিপদ.. অনেক বিপদ আছে, ছিল- তার জীবনে।কিছু কেটেছে..কিছু চিরকালই রয়ে গেছে... থাকবেও? থাকবে কি ভবিষ্যতেও? জানেন না তিনি....

একটা ভ্যান রিক্সা পাশ দিয়ে জোরে চলে গেল..যদ্দুর মনে পরে তিনিও একদিন চেপেছিলেন ওই জিনিসটায়...মা- এর সঙ্গে বা তার স্ত্রীর সঙ্গে... ভ্যান-রিক্সাওলাটা মাথায় প্লাস্টিক বেঁধে চলে গেল... কোথায় গেল? সে কি নিশিবাবুর মতই একা? নানা..তার মতো কেউ না..তাই তার কেউ নেই.. তাই কি? আচ্ছা যখন ভ্যানে চেপেছিলেন তখন রিক্সাওলা বৃষ্টি পড়লে মাথায় কি বাঁধত? কিচ্ছু বাঁধত না.. এ বেঁধেছে কারণ এর ভয়। ভয়... ডাক্তার দেখাতে হবে সর্দি হলে..নিউমোনিয়াও হতে পারে..মারাও যেতে পা--- নানা ... ডাক্তার এর ভিসিট দেওয়ার ভয়ে..বা দামী ওষুধ কেনার ভয়ে..তাই কি? কিন্তু জ্বর-সর্দির ওষুধ এর কি বেশি দাম হবে? কত হবে সেগুলোর

দাম? জানেন না নিশিবাবু...তিনি কি সেগুলো কোনোদিন খেয়েছিলেন যে জানবেন? না মনে পরে, খেয়েছিলেন... যুবক বয়েসে তার একবার কি ..নিউমোনিয়া হয়েছিল? নানা, সাধারণ সর্দি-জ্বর...ওষুধটার নাম মনে থাকলে ভ্যানওলাকে বলতেন..না না, বলতে যাবেন কেন..তিনি তো ওঁর কেউ নন..তার তো কেউই নেই ...

..নাহ!

আরও জোরে পা চালালেন নিশিবাবু... বৃষ্টির জোর বাড়ছে..বাজও পড়ছে! বাজ পড়ছে? কোথায় পড়ে বাজ? আগে আলো-- মানে বিদ্যুত, তারপর বাজ..ছেলেবেলায় মা বলেছিলেন--কিন্তু এগুলো তো এখন বাচ্চারা পড়ে..তিনি হঠাৎ ভাবছেন কেন? আর ভ্যানওলার তো জ্বর হয়নি.. তাহলে বলতে যেতেন কেন ওষুধ এর নাম? কোথা থেকে যে তিনি কোথায়...

এইরে.. এতক্ষণ কোনদিক দিয়ে আসছেন তিনি? পথ গুলোলেন নাকি? এত কথা ভাবতে ভাবতে অন্য কোথাও চলে আসেননি তো? এইটাই হলো বিপদ..কেউ যে সাথে নেই.,(সাথে কেউ থাকলেই পথ চেনা? নয়ত অচেনা?)। ছিলও না...থাকবেও না..তাই নয় কি? না তা নয়..এখন যে জায়গায় তিনি আছেন সে জায়গায় কোনোদিন আসেননি, হয়তো এসেছিলেন এখন ভুলে গেছেন, তাই বলছেন আসেননি...যতসব ঝামেলা..একটা আলো নেই...আর আলো না থাকলে তো বোধহয় কেউ কিছু দেখতেও পায়না... চারিদিকটা কুয়াশায় ভরে গেছে... গেছে নাকি ছিলই ? নিশিবাবু হয়তঃ লক্ষ্য করেননি...কিকরে করবেন, তার তো চোখ খারাপ..নানা খারাপ নয়তঃ..ডাক্তার বলেছিল..এখন তো ডাক্তার দের বিশ্বাস করা কঠিন.. তারা টাকা বেশি চায়.. পেশেন্ট এর ভাল হবে কি না হবে তা দিয়ে তাদের কিস্সুটি এসে যায় না... কেন,তার-ও কি কেউ নেই???

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হন্তদন্ত ভাবে জোর কদমে এগিয়ে চললেন নিশিবাবু.. পথ অজানা..কোথায় যাবেন মনে নেই..ট্রেন ধরতে? না না.. স্টেশন থেকেই তো এলেন ..শেষ ট্রেনে... নানানা। বাড়ি থেকে এলেন, ট্রেন ধরে কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে যাবেন,.. কেন? মাথার ব্যারাম? কি ব্যারাম? জানেন না..কারণ ডাক্তারকে দেখাননি..ডাক্তার জানবেন........পরে, এখন নয়..---

ঐতো স্টেশনে আলো ... একটা ট্রেন চলে গেল.. নিশিবাবু দৌড়ে গেলেন... পিছনে আর তাকালেন না... (একদিন আবার তাকাবেন হয়ত !) ঐতঃ স্টেশনমাসটার দাঁড়িয়ে..এগিয়ে গিয়ে জিগেস করলেন, " কলকাতা-র ট্রেন টা কখন আসবে?"

স্টেশনমাস্টার বললেন, " ঐতঃ দাঁড়িয়ে.. উঠে যান..সাবধানে..পড়ে যাবেননা.."

নিশিবাবু-র অবাক লাগলো..লোকটা তাকে কেন ওরম বলল, তার তো কেউ নেই..না ছিল..! এখন কেউ নেই....

নিশিবাবু কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন..আবার কোনদিকে চলেছেন ? চশমায় একে সবকিছু ঝাপসা ঠেকছে, তার উপর --- নাহ, তার চশমার ডানদিকের কাঁচে একটা বেশ বড় লম্বা চির ... কখন ভাঙ্গলো? তিনি কি পড়ে গিয়েছিলেন? মনে তো পরে না! তবে কি কেউ তাকে আঘাত করতে গিয়ে চশমার কাঁচে বাড়ি মেরে--- নাহ..ঠিক যে কোনটা নিশিবাবু বুঝতে পারলেন না.. পারতেন না.. এখনো পারেন না...

নাহ, সত্যিই সামনে আবছায়া অন্ধকারে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে...... নানা পিছনে যেন আরেকটা ট্রেন..

কোনটা আগে এল! কোনটা তার বাড়ি যাওয়ার চাবিকাঠি? আবার গন্ডগোল..হচ্ছেনাহ হবেওনা... অগত্যা সামনের টাতে না গিয়ে পিছনের টা.. নানা ঐদিক থেকে সামনের ট্রেনটা আবার পিছনে..যাকগে, চুলোয় যাক অ্যাঙ্গেলের হিসেব নিকেশ...ট্রেনটার দরজা খোলা...উঠে সামনেই একটা সিটে বসে পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন নিশিকান্ত বাবু...

পাশেই জানলা...বাইরে দিকে তাকালেন.. মুক্ত সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তর..মুষলধারে বৃষ্টি পরে চলেছে..আকাশ যেন ছিঁড়ে একাকার হয়ে গিয়ে তার সব পুরনো কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে..নতুন কথা—ভবিষ্যতের কথাও! আর একি কান্ড! ট্রেনটা এত চুপ-চাপ কেন? ..কেউ কি নেই? তিনি ছাড়া? নাহ, এবার সত্যি-ই হয়তঃ স্বীকার করতে হয়..তিনি একা... এমনিও.. ওমনিও..!

আরও অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখলেন (চশমার চিরটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে বড় হচ্ছে..তাতে দেখতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে তার) ট্রেনের একটা জানলারও গরাদ নেই...সব খোলা (দুটো গরাদের মাঝের ফাঁকটাকে কি খোলা বলা যায়না যখন গরাদ থাকে ?) ..আর সবকটা চৌকো জানলাও নয়..কয়েকটা কেমন যেন ট্যারা-ব্যাঁকা...হঠাৎ গায়ে এক ফোঁটা জল পড়াতে উপরের দিকে চেয়ে নিশিবাবু চমকে গেলেন... ট্রেনের ছাদ এর অজস্র সুক্ষাতিসুক্ষ ফাটল বেয়ে জল নেমে আসছে চুইয়ে চুইয়ে... অসহ্য বোধ করলেন নিশিবাবু..আগেও করতেন অনেকবার..অসহ্যতা তার জীবনের সঙ্গী (সঙ্গিনী নয় কেন?) ছিল.. তাই না? এখনও যে আছে দেখছেন..নানা দেখছেনই নয় শুধু ..বুঝেওছেন ... শুনতে পাচ্ছেন টিপ টিপ জলের শব্দ..আর বাইরে...আরও তেজ বেড়ে চলেছে বৃষ্টির! হঠাৎ তার ফাটল ধরা চশমা লাগানো চোখটা জানলা দিকে চলে যেতেই অবাক হয়ে গেলেন নিশিবাবু। একি ! ছিল মুক্তপ্রান্তর। (যতদুর মনে পড়ে)। সেটা হঠাৎ এরকম কাঁটাতারে ঘেরা মরুভূমি হয়ে গেল কিকরে! চারিদিকে দেখছেন...শুধু বালির ঢিপির পর ঢিপি...আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছেনা...না দেখতে পাবেনই বা কিকরে..তার চশমা--নানা তার চোখটাই খারাপ! এত কাঁটাতার এলো কোথাথেকে কেজানে.. নিশিবাবুর মাথাটা আবার গুলিয়ে যেতেই তিনি অসহায় বোধ করলেন। হঠাৎ আচমকা তার পিঠে মৃদু চাপে তিনি বুঝলেন তার পাশে একজন আগন্তুক এসে দাঁড়িয়ে তাঁর পিঠে হাত রেখেছে...নিশিবাবুর জীবনে সবাই আগন্তুক..এমনকি তিনি নিজেও..নানা...কি যে বলি..তিনিও "আগন্তুক" নিজের কাছেই!

যিনি এসে দাঁড়িয়েছেন , নিশিবাবু নিশ্চিত না হলেও আন্দাজ করছেন তিনি টিকিটচেকার। লোকটা মোটা গলায় হাত পেতে বলল," ট্রেনে উঠে তো পড়লেন বেশ ... কিন্তু টিকিটটা কই? টিকিট কৈ টিকিট!"

কি বলবেন নিশিবাবু? উত্তর কি বেঁচে আছে? মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জাগলো..আবার গুলিয়ে যাচ্ছে..ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে..চশমার কাঁচের ফাঁক দিয়ে উত্তেজনা এবং ভয় ঝরঝর নানা টপ টপ নানা কিরম করে (বলার কিচ্ছু ঠিক নেই কি বলব জানা নেই !) পড়ে চলেছে....পড়ে কোথায় যে যাচ্ছে..কোথায় যে যাচ্ছে...নানা এসব ভাবার সময় নয় এখন ... তবে কিসের সময়..একটু আগে ছিল বাড়ি ফেরার... এখন টিকিট..সব যে আবার--আবার... গুলিয়ে—গুলিয়ে---

নিশিবাবু শান্তগলায় উত্তর দিলেন," আমার তো টিকিট নেই..মানে এখন নেই। তবে আগেরবার ট্রেনে চাপার আগে কেটেছিলাম , মানে---"

টিকিটচেকার ভদ্রলোক রাগী স্বরে বললেন," আপনি কি বলছেনটা কি! আপনি কি পাগল নাকি! টিকিট না কেটে এরকম ট্রেনে উঠে পড়েছেন?"

নিশিবাবু চুপ...মনের মধ্যে একসারি প্রশ্ন-উত্তর উঠছে নামছে, ভাঙছে, সুর বাঁধছে , আবার কেটেও যাচ্ছে.. তাই আজ তিনি নিরুত্তর...চোখের সামনে টিকিটচেকারের ভয়ানক মুখ যেন ক্রমে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল...একটা বিশাল ধাক্কা..নিশিবাবুর যদ্দুর মনে পরে তিনি একটা ঘাসে ভরা "মাঠ" (মরুভূমি নয়, তবে হয়তো সেটা তার চোখ- বা মাথার ভুল-গন্ডগোল...কাকে দোষ দেওয়া যায় পরে ভাবা যাক!) আর তার পরেই কেমন যেন সব মিলিয়ে যায় তার ভাঙ্গা চশমা-র সামনে থেকে.........

চোখ হয়ত তিনি খুলেছিলেন..হয়তো আজীবন খুলেই রেখেছিলেন.. মনের ভুলে বন্ধ করেননি... যাগ্গে, চোখ যখন মেললেন..আরেকটা দৃশ্য আবার তার মনকে গুলিয়ে দিতে থাকল... চোখের সামনে কুয়াসা .. একটা সাদা বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন..সামনে একজন--একজন সম্ভভত ওটা হাসপাতাল... একজন নার্স দাঁড়িয়ে...তাছাড়া একজন যুবক ডাক্তার তার পাশে একটা চেয়ারে বসে কিসব যেন লিখে চলেছে .. নার্সটি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে ..হাসি দেখেছেন নিশিবাবু..আবার দেখছেন..তিনি কি কখনো হাসেন/হেসেছেন? নিজেকে তিনি কখনও সম্ভবত দেখেননি...নাকি--***যাগ্গে যাই হোক... তিনি কোনোমতে কিছু "কথা" শুনতে পেলেন, মন দিয়ে শুনলেন.. কারণ তাকে কি ঘটল, আর কি ঘটবে...কেনই বা ঘটল..জানতে হবে...না জেনে নিলে তার সত্য-মিথ্যা-নেশ্বী মন কি তাকে ছেড়ে দেবে..মন কবে যে তাকে এরম ভাবে ধরল...উফ... !

ডাক্তার বলে উঠলেন আচমকা-ই.." আপনার প্যারাইটাল বোনে একটা হালকা চোট ছিল.. বাট ইটস ওকে নাউ.. নো নিড টু ওয়ারী এবাউট... আর হ্যাঁ, যাযা ওষুধ বলে দিয়েছি.. খাবেন..আর ওরকম ছেলেমানুষী করবেন না.. পা টা তো ভাঙ্গলেন.. এখন ৩ মাস--

নিশি বাবুর খটকা লাগলো। " কি ছেলেমানুষী?"

ডাক্তার খানিক হা হয়ে থেকে তারপর বললেন," ওমা... আপনাদের ল্যান্সডাউন স্ট্রিট এর বাড়ির ২ তোলা থেকে ঝাঁপ দিলেন.. পা টা ভেঙ্গেছে... মাথায় চোট পেয়েছেন তো বললামই.. তা ছাড়া---"

নিশিবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন," কেন ঝাঁপ দিলাম? বলুন!"

ডাক্তার তাচ্ছিল্ল্যের হাসি হেসে বললেন," হাহা! সে আপনিই জানেন! এরকম সুইসিডল মেন্টালিটি ফিউচারে অনেক প্রবলেম আনতে পারে...বি কেয়ারফুল উইথ ইউর মাইন্ড!"

আর কেয়ারফুল! তার মাইন্ড তার নিজের মাইন্ড-এর যা তা হাল করে রেখেছে প্রতি মুহূর্তে! তাই... তাই তো তিনি..

কি? কখন নিজেকে মারার পরিকল্পনা করলেন? ল্যান্সডাউন স্ট্রিট? জায়গাটার নাম শুনেছেন কি কখনও? মনে তো হয় না.. মন কি সিওর? নানা সিওর নয়..কারণ--- কারণ..কতলা বাড়ি? ২ তোলা থেকে ঝাঁপ? আসলে কত তলা বাড়িটা? ২ তলা কোনদিক থেকে ? উপর থেকে নাকি নিচ থেকে নাকি ডানদিক থেকে নাকি ৪৫ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেল থেকে...নাকি..নাকি!..........................

মাথাটাকে ধরে বসে পড়লেন নিশিবাবু... মনে মনে মন কে বলে চললেন--" চুপ চুপ..একটু নিরবতা...শান্তি...আমার আমার..."

........ডাক্তার আবার লিখতে লিখতে বললেন," আর পারলে সীয়রলি একজন বড় মেন্টাল ফিসিসিয়ানকে কনসাল্ট করবেন...আপনার মাথায় -----"

নিশিবাবু অতি বিরক্তির সুরে গলাটা সপ্তমে তুলে বললেন, "জানি জানি অনেকদিন জানি...নতুন কিছু থাকে তো বলুন..নয়ত..!!! আমি আমি --- " অথচ কিছুই করলেন না নিশিকান্তবাবু...মনের সাথে শরীরকে রিলেট করতে কি তবে তিনি পারছেন না? হাতকে তুলতে বললে হাত কেন উঠছেনা? উনি শেষ ট্রেনে বাড়ি ফিরবেন না? এটা কোথায় আছেন তিনি?"

ডাক্তার কিছুটা ভরকে গিয়ে তারপর বললেন," ডোন্ট প্যানিক ! কাম ডাউন! আপনার ভয়ের কিছু নেই...! কম ডাউন! কিচ্ছু চিন্তা নেই.."

নিশিবাবু জানেন না।"নেই" কথাটা.. কথাটা। নাকি জানেন সেদিন কিছুটা সচেতনতা নিয়ে মনকে বলতেই মন শরীরটাকে স্যালাইন ছিঁড়ে দৌড় দেওয়ালো.... তারপর.. তারপরই হয়তো...না না...তবে কি আগের যত ঘটনা, দেখলেন, বুঝলেন, চাখলেন, শুনলেন-- সবি স্বপ্ন? এটাও কি সেই স্বপ্নের অন্তর্গত? নাকি এটা অন্য স্বপ্ন? নাকি এটা বাস্তব? সেই সত্যি-র জগত? যেখানে মাথায় ডান্ডা মেরে তাঁর সর্বস্ব লুঠ করা হয়েছিল! ..না না তিনি নিশ্চিত নন.... না না নিশ্চিত নন..তার আদতে কোনো পয়সা ছিল না... হতেও তো পারে......

রুদ্ধশ্বাসে দৌঁড়তে থাকলেন চোখ বন্ধ করে... কে যেন পিছন থেকে হাসতে হাসতে বলল..হয়ত ডাক্তার ভদ্রলোকই ... বলল, " আপনার চশমাটাকে খেয়াল রাখবেন, না হলে ঝাপসা দেখবেন.. মাইনাস নাইন পয়েন্ট টু ফাইব..!

এইরে... এইত চশমাটা পরে গেল-- ওহ হঃ..তবে দৌড়তে গিয়েই চশমার ডানদিকের কাঁচটা ভাঙ্গলো..তার মানে এই ডাক্তার, আত্মহত্যার স্বপ্নটা শেষ ট্রেন ধরার আগে দেখা হচ্ছে..নানা সীয়রিটি নেই .. নেই .. নেই ...এরপর আরেকটা স্বপ্ন বা বাস্তব এই একটা ঘটনা তিনি- নিজে-নিজে বুঝলেন..শুধুই...জাস্ট বুঝলেন...

তার শরীর যেন শূন্যে উঠতে শুরু করল.. মানব সভ্যতার থেকে উপরে... অনেক উপরে..যেখানে তার মন নিয়ে যাচ্ছে সেখানেই...তিনি মন এর উপর নির্ভরশীল কি? নানা তা নন..তবে এত কিছু ভাবছেন কিকরে? মনই তো চালায়..না মনে হয়... নাকি শরীর মনকে কোনোভাবে কন্ট্রোল করে? মন আর শরীরকে আলাদা করছেন কেন তিনি ? তবে কোনটাকে একদম পুরোপুরি সত্যি বলে "বিশ্বাস" করবেন? নানা... এখনো সীয়রিটি পাননি..পেলে বলতেন..সিওর..

হ্যাঁ..উঠতে উঠতে একসময় চারদিকটা গোধূলি রাঙ্গা হয়ে উঠলো... মনটা হালকা হতে থাকল..তিনি জানেন না তিনি কোথায়..তিনি মানে "নিশিবাবু" ... কে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল? টিকিট চেকারটাই বা কোথায় তাকে ফেলে দিল?? এখন কোথায় যাচ্ছেন? কোনটা সত্যি? হঠাৎ আবার তার মনে হল তিনি মাঠে দৌড়চ্ছেন... পায়ে আবার ব্যথা করছে প্রচণ্ড..চশমা চোখে নেই..তাই কুয়াশাও নেই..কে দিয়েছিল চশমা? জানেন না..জানবেন না... দৌঁড়তে দৌঁড়তে পায়ের ব্যথা নিয়েই..দৌঁড়তে দৌঁড়তে...দৌঁড়তে থাকলেন... সামনে হঠাৎ জল..কিন্তু নিজেকে, মানে নিজের মন কে বলেও থামতে পারছেন না..নিজের প্রতি কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে জল টা(নাকি জল গুলো?)-র উপর .... শরীর টা গিয়ে পড়ল জল এর মধ্যে..হয়ত বিশেষ গভীর নয়..মনে তো হলো ভেসেই রইলেন! তবে কি তিনি বেশি হালকা হয়ে গেছেন? কি জানেন তিনি....হালকা কিকরে হওয়া সম্ভব... না না... ভুল

হচ্ছে...ঐতঃ.. নিজেকে দেখতে পেলেন জলের প্রতিবিম্বে... এটাই কি তবে তিনি? নানা তিনি নন..কেউ অন্য কেউ এসে দাঁড়িয়ে হয়তো তার সামনে..কিন্তু কেউ তো নেই..আর দেখতে পেলেন না.. সব অন্ধকার..অন্ধকার কালই.. কালো......শুধু কালো হবার আগে তিনি দেখলেন যেন তিনি নিজেই সম্পূর্ণ জল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন...কে যেন তার..........তার.... নাহ..হবেনাহ..হোলোনা... !

****

তবুও...

সে ৪০ বছর আগেকার কথা... শশীনগর নামক ছোট্ট গ্রামটিতে নীলের চাষ হত, ব্রিটিশদের খুব দাপট ছিল সেখানে, নীল চাষ না করলে লোকজনদের ধরে ধরে সাজা দেওয়া হত... সাজা মানে মৃত্যুদন্ড, তাও আবার নৃশংসভাবে!

উকিল নিশিকান্ত মজুমদারের স্ত্রী নীল চাষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তাকে কুপিয়ে খুন করে ব্রিটিশ বড়লাট জন ম্যাগ্লকটন ও তার সঙ্গীরা৷ নিশিবাবু বাঁচাতে গিয়ে মাথায় ভয়ানক লোহার ডান্ডা-র বাড়ি খান-- আর তাতেই--- তাই—মাথায় বাড়ি মেরে নিশিবাবুকে ব্রিটিশরা দলবদ্ধ হয়ে প্রচন্ড মারে (অজ্ঞান অবস্থাতেই) কিন্তু তিনি বাঁচেননি-- নাহ, বাঁচেননি..

** নানা হয়তো বেঁচেছিলেন-- বেঁচে আছেন--- আজও হয়তঃ শেষ ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরছেন.. কত আশা নিয়ে..নিরাশা নিয়ে... আদি-অনন্তকাল ধরে..তিনি বাড়ি ফিরছেন.. !

তাঁর মেয়ে কোথায়? কারা তাকে ওরকমকরে মারল/ মারবে ? কেনই বা মারল? ----

আর নিশিবাবুর একমাত্র ছেলে থেকে যায়-- সেও পালিয়েছিল—বা গুলি খেয়েছিল- খাবে ......দিন, কাল, দেশ -- জানা নেই! সেও পালায়.. বা পালাবে... নয়ত গুলি খেয়ে মারাই গেছিল...গেছে...

****

-- নিশিকান্ত মজুমদার ···

#আরে বাহ..স্বপ্নটাতো বেশ ছিল... তার পুজোর উপনয্াসেরপ্ল্যান হয়ে গেছে! -- ঘুম থেকে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিশিবাবু মনে মনে ভাবলেন৷ #.........

গুপ্তঘাতক - আখর বন্দ্যোপাধ্যায়
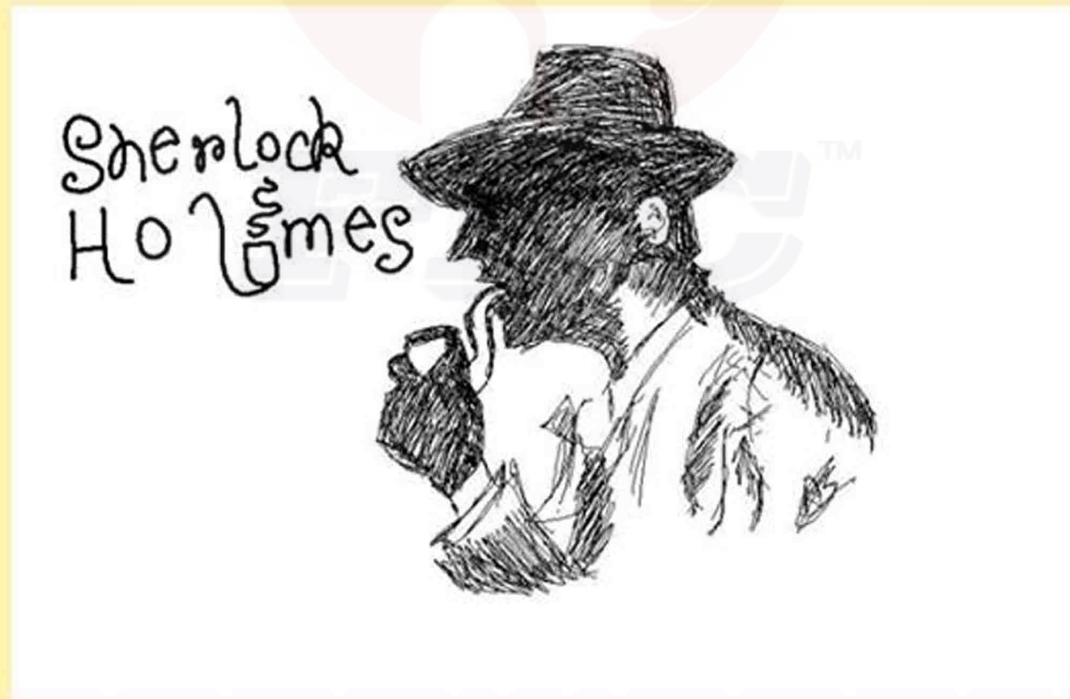
শার্লক হোমস- আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

ক বি তা

শীত

সহেলী রায়

শীতের সকাল
কুয়াশা ঘেরা,
লেপ-কম্বল
যায় না ছাড়া।

শীতের দুপুর--
মিষ্টি আবেশ,
অলস রোদে
স্মৃতির আমেজ।

শীতের বিকেল--
রঙিন ঘুড়ি
খেজুর গাছে
রসের হাঁড়ি।

শীতের রাত
স্তব্ধ, চুপ;
লেপ মুড়িয়ে
স্বর্গসুখ।।

সকল পাওয়া

শুভদীপ ভট্টাচার্য্য

অফিসে যাওয়ার জন্য সৌম্য সবে নিজের পছন্দের নীল কোটটা গায়ে চাপিয়েছে। এমন সময়, "ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং", বাবার রেখে যাওয়া শেষ স্মৃতি, বাড়ির পুরনো টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল চমকে দিয়ে। আজকাল এই ল্যান্ডলাইনগুলো পড়ে থাকে ঘরের এক কোনে, মাসে মাসে টাকা দেওয়ার সময় শুধু জানান দেয় নিজেদের অস্তিত্ব। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা হাতে তুলে -"হ্যালো"

-"কিরে বেটা, চিনতে পারছিস?? আমি অর্ক।"

-"একেবারে Thunderbolt যে, কবে ফিরলি ইন্ডিয়াতে??"

-"এই তো পরশু, তোর মোবাইল নাম্বারটা ছিলনা, পুরনো ফোনবুক ঘেঁটে তোর বাড়ির নাম্বারটা জোগাড় করলাম, আজ কালের মধ্যে ফাঁকা আছিস?? চলে আয় আমার বাড়ি"!

-"আমার আর ফাঁকা, ব্যাচেলর মানুষ, অফিসের পর বাড়ি ফিরে টিভিতে খবর, তার পর রাতের ডিনার করে ঘুম। চলে আসব আজ, অনেক দিন পর দেখা হবে।"

-"ওকে। সী ...ইউ... বাই !...."

কট করে ফোনটা কেটে গেল, সৌম্য গুনগুন গান করতে করতে এগিয়ে গেল নিজের ব্যাগ নিয়ে অফিসের দিকে । গাড়িটা শ্যামবাজারের জ্যামে দাঁড়িয়েছে, সৌম্য নিজের চিন্তায় ডুব দিয়ে চলে গেল নিজের স্কুল জীবনে। সৌম্য রায়, অর্ক দত্ত। ক্লাস সেভেন, দুজনে ছোট থেকেই যাকে বলে বেস্ট-ফ্রেন্ড, একে অন্যকে ছাড়া কোনদিন স্কুলের চিন্তাও করত না। ক্লাস সেভেনে উঠে শুরু হল দুজনের একসাথে একই অঙ্ক স্যারের কাছে পড়াশোনা, বন্ধুত্ব আরও যেন বেড়ে গেল। সেই বারে কপিল দেবের ভারত ক্রিকেট-এর বিশ্বকাপটা জিতেছিল, এখন ভাবলে হাসি পায় রোজ স্কুলে গিয়ে ওদের দুজনের সেই সময়কার উৎসাহের কথা মনে পড়লে। তার পর সব পালটে গেল আসতে আসতে, অর্ক ইংলিশ নিয়ে পড়াশোনা করবে বলে চলে গেল অক্সফোর্ডে, সৌম্য কোলকাতার সিটি কলেজে থেকে গেল। আজ অবশ্য সৌম্য এক বহুজাতিকের বড় চাকুরে, জীবন ওকে সব কিছুই দিয়েছে, উন্নতি, সমাজের চোখে সন্মান, গাড়ি, সব।

সারাদিন অফিসের কাজে ব্যাস্ত থেকে সৌম্য সন্ধ্যে সাতটায় বেড়িয়ে পড়ল অর্কর বাড়ির দিকে, যাওয়ার সময় সাথে নিল এক বাক্স মিষ্টি। জ্যাম কাটিয়ে অর্কর বাড়িতে পৌঁছে অর্ককে দেখে যেন ওরা কিছু বছর পিছিয়ে গেল, জীবনটা কি সত্যি একই আছে?? কিচ্ছু বদলায়নি??

-"আজ কিন্তু তোকে খেয়ে যেতে হবে"

-"খাওয়া ছাড় আগে তোকে ভাল করে দেখি, প্রায় পাঁচ বছর পর দেশে ফিরলি, কেমন লাগছে??"

-"লাগছে এক রকম, আসলে যে কোলকাতাকে দেখব

ভেবেছিলাম সে কোলকাতাকে পেলামনা, সেই পুরনো দিনের আমার চেনা শহরটা যেন পালটে গেল এই পাঁচ বছরে।”

-“যুগ পরিবর্তন, ‘The only constant thing is change’..”

গল্প চলতে লাগল নিজের গতিতে,স্কুল, অঙ্ক স্যার অবিনাশবাবু হয়ে গল্পের মোড় ঘুরল কর্মজগতে। দুজনে দুজনের জায়গায় সফল, কিন্তু সত্যি কি তাই??

-“কলকাতায় আছিস, বড় কোম্পানিতে চাকরী করছিস, আর কি চাই?? নিজের পৈত্রিক বাড়িতে আরামেই থাকছিস, বিয়ে করলিনা, নিজের মত নিজেই চলছিস।”

রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে সৌম্যর বাড়ি ফিরতে এগারোটা বেজে গেল, জীবনের চাওয়া পাওয়া, সব কিছুর হিসেব কষাকষিতে আজ নিজেকে বড়ই ক্লান্ত লাগছে। বাড়ি ফিরে জামাকাপড় বদলে শুতে গেল, কিন্তু ঘুম এলো না। ক্লাস টেনের পরীক্ষার ফল ঘোষণার সময়, ওদের প্রধান শিক্ষকের থেকে একটা মেডেল পেয়েছিল, ওর দায়িত্ব, দায়বদ্ধতার জন্য,স্কুলে সবাই অর্কর থেকেও সৌম্যকে নিয়ে বেশি উৎসাহী ছিল।আজ ওর একটাই পরিচয়, ও এক বহুজাতিকের চাকুরে, যে সকাল ন'টায় অফিসে ঢোকে আর সন্ধ্যে সাতটার আগে অফিস ছাড়ার কথা স্বপ্নেও ভাবেনা। সেই বার পুজোর নাটকের সেরা অভিনেতার পুরস্কার পাওয়া ছেলেটাই কি এই সৌম্য?? যে আজ সারাদিন অফিসের ঘড়ি মেনে নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছে, টাকার পেছনে যে ক্লান্তিহীন ছুট লাগিয়েছে??হ্যাঁ এখন একাডেমীতে রবিবার নাটক দেখতে যেতে সত্যি ক্লান্তি লাগে, ভয় হয় যদি সোমবার সকালে অফিসে যেতে দেরী হয়??আজ ওর মাথায় শুধু ঘুরে বেড়ায় আগের বছরের সেলস ফিগার।

-“কি ব্যাপার রায়?? আজ হঠাৎ দেরী??”

-“কিছুই না, কাল একটু শরীরটা খারাপ ছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।”

নিজের ডেস্কে বসে ল্যাপটপ খুললেও মন পরে রইলো সেই দুর্গা পুজো উপলক্ষে ওদের কলেজের বন্ধুদের ফটোগ্রাফির ঝোঁকটা, সেবার কোন এক মফঃস্বলে ওরা গেছিল ছবি তুলতে, অর্ক?? নাহ অর্ক সেই সময় অক্সফোর্ডের বাসিন্দা। ছবিগুলো বেশ ভাল হয়েছিল, কলেজে অনেকেই প্রশংসা করেছিল, ক্যামেরাটা কোথায় আছে যেন?? মনে পড়ল না ঠিক।

-“সৌম্য... বিগ বস ডেকে পাঠালেন, যাও।”

অরিজিতদা হঠাৎ এসে চিন্তাটার ছেদ ঘটালেন।

-“মে আই কাম ইন স্যার??”

-“হ্যাঁ এসো এসো, আসলে আগের দুবছরের সেলস ফিগারগুলো দেখছিলাম, এ বছরে আমাদের টার্গেটের ধারে কাছেও আমরা যাইনি, কি ব্যাপার বলত??”

-“না আসলে এবারের মার্কেট-এর হালটা খুব একটা......... ”

-“শোনো, ওসব মার্কেটের দিকে মুখ করে থাকলে তো আর কোম্পানি চলবে না, তোমার সেই রিস্ক নেওয়ার অভ্যাসটা আজ হঠাৎ মিসিং কেন?? কিছু কর একটা, এ ভাবে তো সেলস কমতে দেওয়া যায় না”

-“ওকে স্যার, আমি চেষ্টা করব।”

বিধ্বস্ত সৌম্য এগিয়ে গেল নিজের ডেস্কের দিকে, ল্যাপটপটা গুছিয়ে ফাইল পত্তর সরিয়ে ব্যাগ নিয়ে হেঁটে বেড়িয়ে গেল অফিস থেকে। গাড়িতে উঠে চালাতে থাকল... ধর্মতলা পেড়িয়ে ময়দান, আজ

লিগের খেলা আছে দেখেছিল কাগজে, ক্লাব এর সামনে গাড়িটা রেখে ৫ টাকার টিকেট কেটে ফুটবল দেখতে ক্লাবে ঢুকল সৌম্য রায়। কোট, টাই পরিহিতা সৌম্য রায় গিয়ে বসল ভাঙা গ্যালারিতে।

খেলা শেষ হলে, বাড়ি ফিরে সৌম্য চলে গেল বন্ধ পরে থাকা বাবা মায়ের ঘরটাতে, দরজা খুলেই দেখতে পেল সামনে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একটা আঠারো উনিশ বছরের ছেলে,হাতে গীতবিতান, সামনে আগের জন্মদিনে পাওয়া গিটার,সামনে পুজো না?? বিজয়া সম্মেলনিতে গিটার তো তাকেই বাজাতে হবে, সামনের শোকেসে সাজানো সব বই, চাঁদের পাহাড়, টিনটিন, শ্রীকান্ত, আনন্দমঠ, সাথে এক কোনে লুকিয়ে রাখা “How to be a good communist”.. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সঙ্কলন দিয়ে ঢাকা। সবে কলেজে উঠে সামাজিক হওয়ার প্রয়াস আর কি।

মোবাইলটা টেবিল এ রেখে সৌম্য ছুটে গেল ল্যান্ডলাইন-এর দিকে,

-“হ্যালো অর্ক??”

-“হ্যাঁ, বল কি ব্যাপার...”

-“বাড়ি ফিরেছি একটু তাড়াতাড়ি, কাল বললি আজ কোথাও যাওয়ার নেই তোর, ফাঁকা আছিস, আসতে পারবি এখন?? ক্যারাম খেলবি?? সেই স্কুলে পড়ার সময় যেমন অবিনাশবাবুর অঙ্ক ক্লাসের পর খেলতাম, সেরম??”

-“তোদের বাড়ির পাশে সেই বিনুকাকার চপের দোকানটা আছে তো?? তুরন্ত ওখান থেকে গরম গরম শিঙ্গাড়া আর গরম ভাজা চানাচুর রেডি রাখ, আমি আসছি শর্মা থেকে রাবড়ি নিয়ে, রাতে খাবো, আর হ্যাঁ তোদের সেই স্পেশাল লেবু চা টা...”

-“যো হুকুম জানাব...”

ফোনটা রেখে সৌম্য চলে এলো বাবার ঘরে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে এক বাসন্তি পাঞ্জাবি পড়া এক সদ্য কুড়ি পেরোনো ছেলে, মুখে উস্ক খুস্ক দাড়ি... নিজের অজান্তেই চোখের কোনটা ভিজে গেল, সব বাঁধন ভেঙ্গে আজ কেঁদে উঠল সৌম্য, অনেক দিন পর,অনেক বছর পর। সে পেরেছে, সে ফিরে আসতে পেরেছে, এ ভাবেও ফিরে আসা যায়।

চোখ মুছে সৌম্য বেড়িয়ে গেল বিনুকাকার দোকানের দিকে, এখন যে অনেক কাজ, সামনেই যে পুজো, এবারের নাটকটা সে পরিচালনা করবে, আর গিটারটা আবার শুরু করতে হবে, যদি কোনদিন পাড়ায় বাজানোর সুযোগ আসে।

এখন আপাতত ক্যারাম!!......................

ফেসবুক সরগরম - তৌসীফ হক
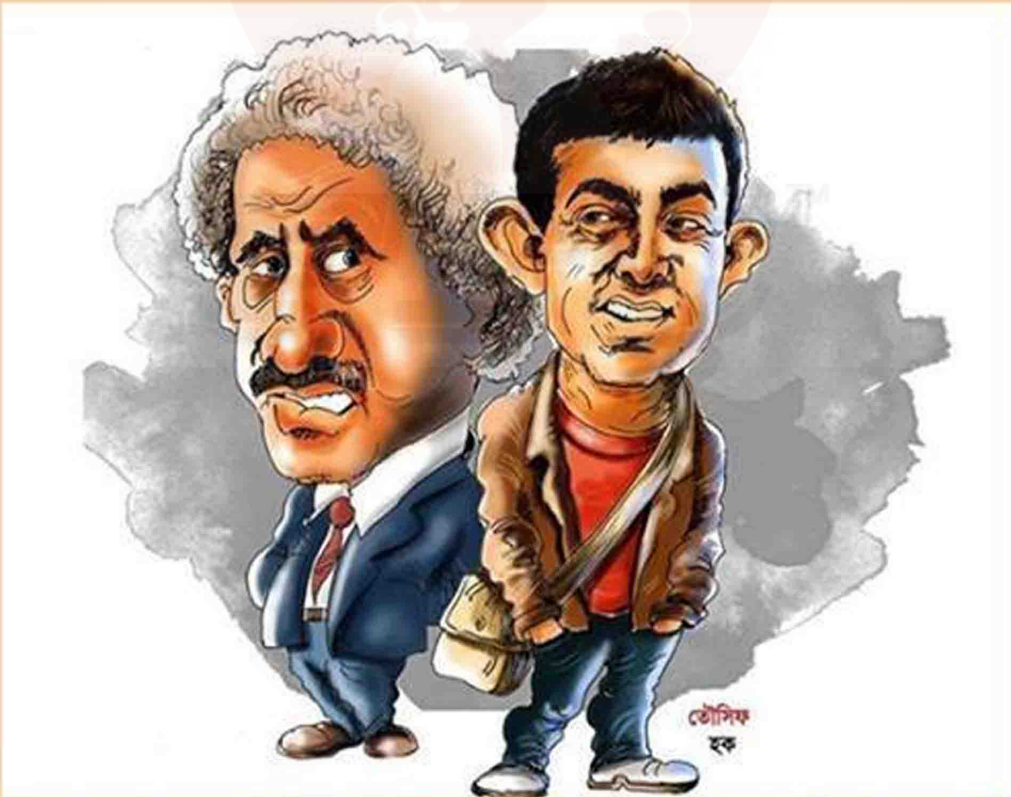
ওয়াংরু আর বদমেজাজি ভাইরাস - তৌসীফ হক

হুতোম

অতনু কুমার

তার নাম হুতোম। আমার খুব বন্ধু, যাকে বলে বেস্ট ফ্রেন্ড। "সে কি তোমার ইস্কুলে পড়ে? ... "না" "তোমার বাড়ির পাশে থাকে বুঝি? বিকেলবেলায় তার সঙ্গে খেল?" ... "উঁহু" "তাহলে নিশ্চয়ই তোমার আত্মীয় হয়?"... "একেবারেই না" ।

আরে বন্ধু হলেই কেমন করে হয়েছে বলতে হবে না কি! সে যে আমার বন্ধু, এটাই তো সবচেয়ে বড় কথা। কোথায় থাকে? এই ধরে নাও পটলতলা। কি বলছ? পটলতলা কোনও জায়গার নাম হতে পারে না? কেন? তালতলা হতে পারে, আমতলা হতে পারে আর পটলতলা হতে পারে না? আর না পারে তো বয়েই গেল, ধরে নিতে দোষ কি?

হুতোম সবসময় আমাকে সাহায্য করে। পড়ার সময়, খেলার সময়, ইস্কুল যাবার সময়, টিভি দেখার সময়। আমি ডাকলেই সে চলে আসে। তবে সাবধান, তোমাদের বিশ্বাস করে বলছি কিন্তু, কাউকে বলে দিওনা যেন, বিশেষ করে আমার বাবা-মা কে। ওরা জানেই না হুতোমের কথা। জানেনা বললে অবশ্যি একটু ভুল হবে, জানতে চায় না, মানে বিশ্বাসই করে না । এই তো সেদিন হুতোমের সঙ্গে পাঞ্চাটুলি গিয়েছিলাম, বাবার বন্ধু দেবেশকাকু দেখে ফেলেছে আর বাবাকে এসে রিপোর্ট করেছে। বাবা চোখ পাকিয়ে বলল, "অতদূরে গিয়েছিলে কেন একা একা ?"

"একা কোথায়! হুতোম ছিল তো সঙ্গে।" "হুতোম আবার কে? কতবার বলেছি, ঐ সব বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না?"

বোঝ কথা!! হুতোম না কি খারাপ ছেলে!! তাহলে ভাল ছেলে কারা? যারা সারাদিন বইমুখে বসে থাকে, সকাল বিকেল সেজেগুজে পড়তে যায়, বাসে বুড়োলোকেদের সিট ছেড়ে দেয়না, রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তারা ? এসব কথা অবশ্যি বাবাকে বলিনি। বলে কোনও লাভ নেই। বয়স হলে বুদ্ধিটা যে কেন কমে যায় কে জানে !

একদিন বাবা-মার সঙ্গে বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম ট্রেনে চেপে। ফেরার সময় কি ভীষণ ঝড়বৃষ্টি। ট্রেন থেকে নেমে তো মাথায় হাত। বাস, অটো, রিকশো, কিচ্ছু নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাবা বলল, "বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই, আর কিছু পাওয়া যাবে না। এবার হাঁটা লাগাতে হবে।" ঠিক সেই সময় একটা অটো এসে দাঁড়াল। তখন আর দরদাম করার সময় নেই, হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। সে অটো কোথায় যাব কিছু না শুনেই রাস্তায় নেমে পাঁইপাই করে ছুটতে লাগল। মা তো ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। বাবা যত বলে আস্তে চালাতে সে তত জোরে চালাতে থাকে। আধঘন্টার রাস্তা দশ মিনিটে পার করে পয়সা

দেওয়ার আগেই আমাদের নামিয়ে দিয়ে হুউউস করে বেরিয়ে গেল। বাবা-মা তো অবাক। আমি অবশ্য অবাক হইনি, কারণ আগেই বুঝতে পেরেছিলাম কে অটো চালাচ্ছে, কিন্তু সে চোখ দিয়ে ইশারা করাতে কিছু বলিনি। তবে হুতোম যে অটো চালাতে পারে তা আগে জানতাম না।

পরে হুতোমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি অটো কিনলে নাকি?" "দ্যুৎ, তোমার যেমন বুদ্ধি! ওটা তো সামিরের অটো। সে ব্যাটা তো আর বেরোবে না, তাই আমিই নিয়ে এলাম। ও কিছু জানতেই পারেনি, কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছিল তো।" "অ্যাঁ! তাহলে নিলে কিকরে? চুরি করেছ না কি?" "চুরি করতে যাব কেন? আমি তো আবার রেখে এসেছি। তাছাড়া সামির আমার খুব ভালো বন্ধু, তোমার মতই।"

এই হল হুতোম। হুতোম পারেনা এমন কাজ বোধহয় নেই। কিন্তু সে যে কোন ক্লাসে পড়ে সেটা কিছুতেই বলবে না। তবে আমি যখনই ইস্কুলে যাই, তখন দেখি হুতোম জানলা দিয়ে বা গাছের ডাল থেকে উঁকি মারছে, কখনও বা আমার পাশে এসেও বসে পড়ে। কেবল আমিই ওকে দেখতে পাই, আর কেউ পায় না। তবে কোনোদিন আমার হোমটাস্ক করে দেয়নি। যদিও আমি জানি ও অঙ্ক খুব ভালো পারে। কিন্তু সেকথা বললেই দুদিকে ঘাড় নেড়ে বলবে, "ওটি হচ্ছে না, তোমার অঙ্ক তোমাকেই করতে হবে।"

আমাদের ইংরেজি স্যার সাংঘাতিক লোক। ছাত্রদের পেটাতেই তাঁর আনন্দ। তিনি ইচ্ছে করেই ভয়ংকর সব ট্রান্সলেশন দেন, বিচ্ছিরি সব শব্দের মানে জিজ্ঞেস করেন আর উত্তর অনুযায়ী বিভিন্ন রকম শাস্তি দেন।

যারা মার খেল তাদের তবু ভাগ্য ভালো। কাউকে হয়ত বললেন চেয়ার, ব্যাস ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত শূন্যে চেয়ার হয়ে বসে থাকতে হবে। কাউকে যদি বলেন এক পা, অমনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। একদিন তিনি ভবানীকে ধরেছেন, "বলতো ফুলিজিনাস মানে কি?"

ভবানী অনেকটা ভেবেচিন্তে, খানিকটা কানটান চুলকে বলল, "ফুলিজিনাস মানে ফুলিশ মানে বোকা কিন্তু জিনিয়াস।"

"বেশ বলেছিস, ঠিক তোর মতই। আয় জিনিয়াসগিরি কাকে বলে দেখিয়ে দিই", স্যার ভবানীর কানের দিকে হাত বাড়াতেই হুতোম স্যারের কানটাকেই পাকড়ে ধরল। স্যারের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। এদিকে হুতোমকে আমি ছাড়া কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সবাই তাজ্জব। হুতোম স্যারের কানে কি একটা বলে ছেড়ে দিল। ভবানী সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে স্যার?"

স্যার কিছু না বলে পেনটাকে পকেটে পুরে রোলকলের খাতাটা টেবিলেই ফেলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। হুতোমকে জিজ্ঞেস করলাম, "স্যারকে কানে কানে কি বললে তখন?" "কিছু না, বললাম আপনি আসার সময় যে দুধটা না খেয়ে নর্দমায় ফেলে দিয়েছেন, তা কিন্তু আপনার স্ত্রী দেখে ফেলেছেন।"।

এই যে এতক্ষণ হুতোমকে নিয়ে আবোল তাবোল বকলাম, তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, হুতোমটা আসলে কে? মানুষ? ভূত? রোবট? না কি অন্য গ্রহের জীব? তোমরা ভাবতে থাক, আমি যাই, হুতোম ডাকছে।

ফেলুদা স্পেশাল

ফেলুদার আমন্ত্রণ

মোঃ আঃ মুকতাদির

ফেলুদার আমন্ত্রণে তার বাড়িতে বিখ্যাত কয়েকজন লোক এসেছে। এদের মধ্যে আছেন কাকাবাবু, সন্তু, তোপসে, জটায়ু, প্রফেসর শঙ্কু, অবিনাশবাবু, তারিণীখুড়ো। তাদের মধ্যে মানুষের মন নিয়ে কথা হচ্ছে।

কাকাবাবু: বুঝলি সন্তু, মানুষের মন হচ্ছে এমন জিনিস যার তল মানুষ নিজেই খুঁজে পায় না।

সন্তু: এসব কথা রেখে বল পরের অভিযানে আমাকে সাথে নেবে কিনা?

শংকু: মানুষের মন বোঝার জন্য একটা মেশিন বানাতে হবে।

অবিনাশবাবু: কিন্তু এই মেশিনটা আপনার কি কাজে লাগবে, শঙ্কু বাবু?

ফেলুদা: কেন, এটা দিয়ে অপরাধীর চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

অবিনাশবাবু: এটা দিয়ে কাজের চেয়ে অকাজই বেশি হবে। ধরুন কোন স্ত্রী যদি স্বামীর মন জেনে যায় তবে সে স্বামীর আর রক্ষা নেই। কোন কোন পরনারীর প্রতি তার টান আছে স্ত্রী সব জেনে যাবে। এতে সংসারে ঝামেলা বৃদ্ধি পাবে।

জটায়ু: বাহ আপনারা মানুষের মন নিয়ে কথা বলছেন আর আমি একটা গল্পের প্লট পেয়ে গেলাম। প্রখর রুদ্রের পরের গল্প "মানবমনে মারামারি।"

তোপসে: নিজের মন কি চায় তাই বুঝতে পারিনা আবার মানুষের মন।

তারিণীখুড়ো: মানুষের মন নিয়ে আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে। তখন আমি

থাকতাম.............

অবিনাশবাবু: আপনাদের মন যা চায় চাক, আমার মন চাইছে মাছ ভাজা খেতে।

ফেলুদা একটু উঠলেন কে যেন তার খোঁজ করছে, এটা দেখতে। কাকাবাবু উঠলেন বাগান

দেখতে। প্রফেসর শঙ্কু তার সঙ্গ নিলেন। এই সুযোগে জটায়ু অবিনাশবাবুর সঙ্গে

আলাপ জমাবার প্লান করলেন।

জটায়ু: আচ্ছা অবিনাশবাবু, আপনি প্রখর রুদ্রের নাম শুনেছেন?

অবিনাশবাবু: প্রখর রুদ্র নয়, প্রখর রৌদ্রের নাম শুনেছি৷ যখন চৈত্র বৈশাখ মাস পড়ে তখন সূর্য ভীষণ রোদ ছড়ায়৷ এটাই প্রখর রৌদ্র৷ জটায়ু কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন৷

জটায়ু: আপনি কোন রহস্য রোমাঞ্চ গল্প পড়েন নি?

অবিনাশবাবু: ওসব ছাঁইপাশ আমি পড়ি না৷ হ্যাঁ, একবার এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে পড়েছিলাম হন্ডুরাসে হাহাকার৷

জটায়ু: (খুশি হয়ে) আপনি হন্ডুরাসে হাহাকার পড়েছেন?

অবিনাশবাবু জটায়ুকে চেনেন না৷ তাই বলেই ফেললেন-

অবিনাশবাবু: হ্যাঁ পড়েছি, গাঁজাখুরি গল্প আর কাকে বলে৷ এসব লেখকদের মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নাই৷

জটায়ু আর কথা বাড়ালেন না৷ ইতোমধ্যে অন্যরাও এসে গেল৷ এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে মগনলাল মেঘরাজের আগমন৷

মগনলাল: কি ব্যাপার ফেলুবাবু, ইতনা বড়া বড়া আদমিকো বোলিয়ে৷ লেকিন হামার কথা ভি মনে পড়ল না? হামি কি এতই বদমাশ আছি?"

ফেলুদা: আমরা এখানে মানুষের মন নিয়ে আলোচনা করছি৷ আপনি এখানে এসে কি করবেন?

মগনলাল: ইনসানকা মন? ইনসানকা মন এক আজব আছে৷ ও ছুধু খালি চায় টাকা ডলার পাউন্ড৷

ফেলুদা: মানুষের মন যেমন অদ্ভুত তেমন বিচিত্র৷ বহু রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে আমি দেখেছি অপরাধীর মনে থাকে নানা জটিলতা৷

জটায়ু: কি রকম?

ফেলুদা: অপরাধী যখন কোন অপরাধ কর্মকান্ডের প্ল্যান করে তখন থেকে তার মনের জটিলতার জাল বিছাতে শুরু করে৷ এভাবে অপরাধী যত বড় হয় তার মনের জটিলতার জালও তত বড় হয়৷ আর এই জাল কেটে তার কাছে পৌঁছানই আমার কাজ৷ আমি আমার "পর্যবেক্ষণ শক্তি" আর "বুদ্ধি" দিয়ে অপরাধীর মন বুঝতে চেষ্টা করি৷ তাতে অপরাধের জাল ডিঙানো সম্ভব হয় এবং রহস্যেরও সমাধান হয়৷

জটায়ু: সত্যিই, আপনার চিন্তা ধারার সাথে আমার চিন্তা ভাবনা কেন জানি মেলে না৷ আপনি আসলেই আলাদা অনন্য৷

সবাই একত্রে বলে উঠলেন: "YES......."

কবিতা
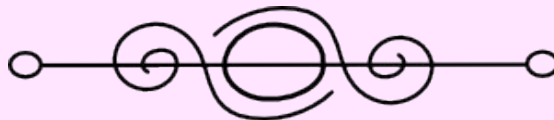
ভাবনা

সোমা মজুমদার

প্রতিদিন ভাবি বসে মৃত্যু আসুক,
কিন্তু সে আসেনা;
মনের কোণের ব্যাথাগুলো জেগে ওঠে
কাঁটার মত বেঁধে বুকের মাঝে
চাপ চাপ জমা অভিমান গুলো, ফুলের মত
ঝড়ে পরে মনবৃক্ষ থেকে,
জমে থাকা মেঘ গুলো
ডানা মেলতে চায় মনের আকাশে,
কিন্তু পারে না;
কে যেন কেটে দিয়েছে তাদের ডানা।
কেন রোজ ভোর হয়, সূর্য ওঠে
তবু কেন মনের অন্ধকার হয়না দূর
জমাট বাঁধে নিকষ কালো অন্ধকার গুলো,
আরও ঘন হয়ে ওঠে;
তবুও ঘুম থেকে উঠতে হয়
মুখোমুখি হতে হয়, ওই নিষ্ঠুর পৃথিবীর
তারই মাঝে অতীত ফিরে আসে বারেবারে
ডাকে হাত বাড়িয়ে, কিন্তু ছোঁয়া যায়না
যেদিন সুখ ছিল, ছিল আশা
আজ কিছু নেই, কেউ নেই।

যেতে যেতে একলা পথে

সন্দীপ দাস

।।১।।

বেশ কিছুদিন ধরে কাজের চাপটা খুব বেড়ে গিয়েছে, প্রাণভরে যে একটু নিঃশ্বাস নেবে সে সময়ও দেবাদিত্যের নেই। একযোগে অফিসের তিন সহকর্মী ছুটি নিয়েছে সপ্তাহ খানেকের জন্য সপরিবারে প্রমোদ ভ্রমণে পুরী যাবে বলে আর তার ফল ভোগ করতে হবে দেবাদিত্যকে। তিনজনের কাজের ভার ওর উপর না পড়লেও অন্তত পক্ষে দেড় জনের অতিরিক্ত কাজ ওকে প্রত্যহ করতে হচ্ছে, তা কি কিছু কম হল? শ্যামলদা যে কিভাবে তিনজনকে একসঙ্গে ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন কে জানে? অন্যদিকে যত আবদার কেবল দেবাদিত্যের কাছে, দেবা আজ এই কাজগুলোও করে দিস, পারলে প্রিয়তোষের ফাইলগুলো একবার দেখে নিস, কিন্তু কেন, কেন করব আমি এত কাজ?- দেবাদিত্য ভাবে মনে মনে কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়াল সক্কাল বেলা শ্রেয়ার সঙ্গে একপ্রস্থ অহেতুক কথা কাটাকাটি, কোনও মানে হয়। এসবের ধাক্কায় আজ পুকাইটাকে স্কুলে পৌঁছে দিতে গিয়েও দেরী হয়ে গেল। হায় রে, আমার আদরের পুকাইটাকে ওদের রত্না ম্যাডাম হয়তো পুরো প্রথম পিরিয়ডটা নিল ডাউন করে রাখবে। এত অশান্তির মাঝে আবার জয়ন্তটা সকাল সকাল পুরীর সমুদ্র সৈকত থেকে ফোন করে ন্যাকামি করছে, ভাই আমার পক্ষের কাজটা পারলে একটু করে দিস, যতসব আমার ভাগ্যেই জোটে, মনে মনে নিজের উপর গজগজ করতে থাকল দেবাদিত্য।

মোজাটা আবার কোথায় গেল ? শ্রেয়ার আজকাল কাণ্ড-জ্ঞান খানা ক্রমে ক্রমে লোপ পাচ্ছে। কতবার বলেছি আমি অফিস বেরনোর সময় আমার পাশে পাশে থাকবে, কখন কি দরকার হয়, তা না উনি এখন গেছেন উপরতলায় মাকে ছোট মাছের ঝাল খাওয়াতে। একরাশ বিরক্তি বুকে নিয়ে শ্রেয়াকে ডাকতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে কলিং বেলের তীক্ষ্ণ বিরক্তিকর চিৎকার দেবাদিত্যের ক্রোধকুন্ডে ঘৃতাহুতি করল। এখন আবার নতুন করে জ্বালাতে কে এলো রে বাবা?

কষাটে গলায় জিজ্ঞেস করল - কে?

কোনও উত্তর এল না ওপার থেকে, তিতিবিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল দেবাদিত্য। গেটের ওপারে দাঁড়িয়ে বছর চোদ্দ-পনেরর এক বালক। ছিপছিপে চেহারা, পরনে জরাজীর্ণ শার্ট ও হাফ প্যান্ট। পায়ে তাপ্পি মারা এক চপ্পল, দারিদ্র্যের ছাপ ফুটে বেরিয়ে আসছে। শুধু চোখ দুটো পাথরের মত স্থির, যা দেবাদিত্যের মুখের দিকে না জানি কি অভিপ্রায় নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। নিশ্চিতভাবে সাহায্য চাইবে, দেবাদিত্য মনে মনে ভাবল।

গলাটাকে যতটা সম্ভব দৃঢ় করে জিজ্ঞেস করল দেবাদিত্য – কি চাই রে?

হাতজোড় করে মুখটাকে গেটের আরও কাছে নিয়ে এসে ছেলেটা বলল – কৃপা করুন বাবু। খুব বিপদে পরে এই পথে নামতে হয়েছে, আমি ভিখারি নই বাবু, তবে আজ আমি সাহায্যপ্রার্থী।

- বা, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারিস তো, কে শিখিয়ে দেয় এসব?

- গরীবকে কেউ কিছু শিখিয়ে দেয় না বাবু, সে নিজে নিজেই সব শিখে নেয়। আমাদের শেখানোর পড়ানোর সময় কোথায় কারো কাছে।
- আসল কথায় আয়, কি চাই সেটা বল।
- অল্প কিছু অর্থ সাহায্য বাবু। আমার বাপ দু'রাত আগে মারা গেছে জ্বরে, অনেকে বলছে বাপের নাকি ফেঙ্গু বলে কি এক রোগ হয়েছিল। এখন আবার আমার ছোট্ট বোনটাও জ্বরে পরেছে, এটাও ফেঙ্গু কিনা কে জানে।
- সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যা বোনকে, এখানে এসেছিস কেন?
- তাই যেতাম বাবু কিন্তু আমাদের বস্তি থেকে হাসপাতাল যে অনেক দূর, এই অবস্থায় ওকে নিয়ে অত দূর যেতে ভয় হয় আর মা বলছে বাপের শ্রাদ্ধ পূজা না করে এখন বাইরে গিয়ে থাকা ঠিক নয়। এই অবস্থায় হাসপাতালের মাটিতে বোনকে কি করে ফেলে রেখে আসি বলুন।
- কিন্তু আমার যে কিছু করার নেই।
- এমনটা বলবেন না বাবু, অল্প কিছু পয়সা দিন না বাবু, বোনটাকে যাতে একটা ডাক্তার বাবুকে দেখাতে পারি, কেউই যদি সাহায্য করতে না চায়, তাহলে আমার ফুলিটা মরে...ও বাবু...
- আহা, এত কথা বাড়াচ্ছ কেন ? ওর হাতে কটা টাকা দিয়ে দিলেই তো পার।

কখন যে শ্রেয়া এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে বুঝতেই পারেনি দেবাদিত্য। স্ত্রীর কথা শুনে হাসি পেল ওর, মুখে বলল - তোমার এত দরদ উথলে পরলে তুমি দাও গে, আমার দরদ বড় কম গো।

শ্রেয়া আর কথা না বারিয়ে, হাতের ব্যাগ খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে ছেলেটার দিকে বারিয়ে দিল।

দেবাদিত্য এ দৃশ্য দেখে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না, বলে বসল – তোমার মত মহিলাদের দাক্ষিণ্যেই আজ দেশের এই হাল, মুখটা ভালো করে চিনে রাখ ছেলেটার, এরপর থেকে তো প্রায়ই আসবে কখনও মায়ের কখনও বা বোনের শ্রাদ্ধের পয়সা নিতে।

- এমন কথা বলবেন না বাবু, আমি গরীব, তবে মিথ্যুক নই।
- কেন যাতা বলছ ? কোন এমন রত্নভাণ্ডার আমি ওর তরে উজাড় করে দিয়েছি বলতে পার? ধমকের সুরে শ্রেয়া বলল।

ছেলেটা ততক্ষণে পয়সা নিয়ে পাশের গলিতে মিলিয়ে গেছে, দেবাদিত্যের মাথায় একটাই প্রশ্ন ঘুরছে এখন, ছেলেটা আমাদের পাশের বাড়ি গেল না কেন ? তারপর পিছন ফিরে শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে বলল – যতসব ঠক, প্রবঞ্চকের দল। মাস দুয়েক পর এই ছেলে যখন আবার বাপের শ্রাদ্ধের জন্য টাকা চাইতে আসবে, তখন বুঝবে, এই শর্মা কিছু ভুল বলে না। সেদিন যদি তোমার শিক্ষা হয়।

দেবাদিত্যের কথা শুনে শ্রেয়া একটা শুকনো হাসি হাসল, যার গূঢ় অর্থ বোঝা দেবাদিত্যের পক্ষে অসম্ভব। দেবাদিত্য ভাবল,ইদানীং আমাদের সম্পর্কটা বড় বেশী খাতায় কলমের হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হৃদয়ের মাঝে সংযোগের একমাত্র তরী পুকাই, ও না থাকলে বাকবিতণ্ডার সুনামি তাণ্ডবে কবেই আমাদের সম্পর্কটা মহা-সলিলে লীন হয়ে যেত।

।।২।।

শুক্রবার যখন অফিস থেকে ফিরছে দেবাদিত্য তখন ও আর নিজের মধ্যে নেই। এই এক সপ্তাহের কাজের চাপে নিজেকে বেশ প্রৌঢ় মনে হচ্ছে, যেন একটা সপ্তাহ নয় আস্ত ক'টা বছর অতিক্রম করে ফেলল।

ইচ্ছে ছিল বাড়িতে গিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে দেবে নরম সোফার কোমল বুকে, চোখ বুজে অনেকটা সতেজ বাতাস ঢুকিয়ে নেবে নিজের ফুসফুসের বদ্ধ কুঠরিতে আর তারপর যাবতীয় চিন্তা ভাবনাকে দূরে সরিয়ে ডুব দেবে শান্তির নিদ্রার গহন অরণ্যে, যেখানে আর কারও প্রবেশের অধিকার নেই। কিন্তু দেবাদিত্যের

অদৃষ্টে সে সুখ কোথায়, বাড়ি ঢোকার সাথে-সাথেই খবরটা পেল, দরজা খুলেই শ্রেয়া বলল – তুমি ওখানে যাও নি ? খবর পাওনি নাকি?

একে শরীর জুড়ে অপার ক্লান্তি তার উপর চোখের সামনে আহ্লাদী সোফাটা নিজের বক্ষ উন্মীলিত করে দেবাদিত্যকে যেন তার কাছে ডাকছে, এই জোড়া অনুভূতির সাঁড়াশি আক্রমণে শ্রেয়ার কথা দেবাদিত্যের কান অবধি পৌঁছালেও কর্ণ-ছত্রের তীব্র প্রতিঘাতে প্রতিফলিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে, কোনও অংশই ভিতরে পৌঁছালো না।

শ্রেয়া বেশ ব্যস্ত হয়ে আবার বলল – কি গো ? তুমি গেলে না নবারুণদার বাড়ি, সবাই তো গেছে শুনলাম।

নবারুণের নামটা দেবাদিত্যের কানে পৌঁছাল, পৌঁছাবে নাই বা কেন, জীবনে মা –র পর যাকে সবচেয়ে বেশী কাছের মনে করেছে সে যে নবারুণ, দেবাদিত্যের স্কুল ফ্রেন্ড, তার সব পাপের অর্ধেক ভাগীদার, পুণ্যেরও। কিন্তু হঠাৎ করে সবাই নবারুণের বাড়ি গেছে কেন ? দেবাদিত্যের মনটা নিজের অজান্তেই কু ডেকে উঠল।

- কি হয়েছে নবারুণের ? কি হয়েছে?
- দীপালি কাকিমা মারা গেছেন।
- কি বলছ ? আমি তো কিছুই জানিনা।
- তোমাকে আমি জানাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তোমার ফোন সুইচ অফ পেলাম। আমি ভাবলাম তুমি হয়তো খবর পেয়ে ওখানে চলে গিয়েছ, তাই.........
- তোমাকে কে খবর দিল ? কতক্ষণ আগে ঘটেছে?
- বিকেলের দিকে, সেরিব্রাল অ্যাটাক, মুহূর্তের মধ্যে নাকি সব শেষ। অরিজিতদা ফোন করে জানাল। আমি মা বাবাকে কিছু জানাইনি। দীপালি কাকিমা তো শুনেছি মা-র সবথেকে ভালো বন্ধু ছিল। ঘটনাটা শুনে মা কিভাবে রি-অ্যাক্ট করবে সেই ভয়ে আর জানাতে পারিনি।
- ভালোই করেছ, এখন জানাতে হবে না। আমি বরং এখুনি বেরিয়ে পড়ি, আমি ফিরে এসে মাকে জানাব।

কথাটা শেষ করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল দেবাদিত্য। অন্য সময় হলে শ্রেয়া নিশ্চিতভাবে তাকে দুটো কিছু মুখে দিয়ে যেতে বলত কিন্তু আজ ওরও বাকরুদ্ধ। ও জানে দীপালি কাকিমা দেবাদিত্যের কাছে শুধু নবারুণের মা নন, দেবাদিত্যের নিজের মায়ের মত। ছোটবেলায় দেবাদিত্য যাকে আদর করে বলত, “মাসিকাকিমা”।

পুরনো স্মৃতি ঝড়ের মতো ধেয়ে আসছে দেবাদিত্যের দিকে। কোনোটার থেকে কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে নিলেও অন্যগুলো সপাটে আঘাত হানছে দেবাদিত্যের বুকে, মুখে, চোখে। দীর্ঘদিন ধরে যে চোখে ভাটা পড়েছে তা আবার ভেসে যেতে চাইছে জোয়ারের আমন্ত্রণে।

দেবাদিত্য ভাবছিল কোথায় যাবে সে ? নবারুণদের বাড়ি নাকি শ্মশানে ? শেষে অরিজিতের কথা মাথায় এলো, ওই তো শ্রেয়াকে খবরটা দিয়েছিল, ভাবা মাত্রই ফোন।

বার-দুয়েকের চেষ্টার পর লাইনটা লাগল। উত্তেজিত গলায় অরিজিত বলল – তুই কোথায় দেবাদিত্য? খবরটা পেয়েছিস?

- হ্যাঁ সবেমাত্র পেলাম, আমি আসছি। তোরা এখন কোথায়?
- নিমতলা যাচ্ছি, এইমাত্র রওনা দিয়েছি। তুই সরাসরি ওখানে চলে আয়।
- হ্যাঁ, আসছি।

ফোনটা রাখার পর মনটা আরও কয়েকশো গুণ ভারী হয়ে গেল দেবাদিত্যের। জীব আর জড়ে ভরা এই সংসারে সবথেকে দুঃখী জীবের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখী জড়ের সাথে আমাদের পরিচয় আছে, সে এই মহাশ্মশান। মানুষ এখানে কেবল জ্বলতে আসে, জ্বালাতে আসে, কাঁদতে আসে, অপরকে কাঁদাতে আসে। এর থেকে কবরস্থানই বরং ভালো, ওখানে কান্না আছে কিন্তু এত আগুন নেই।

ভ্রমণপিপাসু মানুষ কবরস্থানের শিল্পগত কৃষ্টি দেখতে মাঝে মাঝেই সেখানে হানা করে, ফটো তোলে, তাতে হাসি থাকে, ভালবাসা ও, কিন্তু হায়রে শ্মশান তোর জীবন জুড়ে শুধুই জ্বালা, শুধুই চোখের জল।

।।৩।।

দেবাদিত্য যখন নিমতলা পৌঁছালো তখন এগারোটা বেজে গেছে। শ্মশানঘাট জুড়ে তবু লোকে লোকারণ্য, মৃত্যুর যে সময় বলে কিছু থাকে না। যে যার শব আগলে বসে রয়েছে নিজেদের পালা আসার প্রতীক্ষায়। জীবন ভর মানুষকে কেবল অপেক্ষাই করে যেতে হয়, জন্মদাত্রী মাকে তার সন্তানের মুখ দেখার জন্য ৯মাস অপেক্ষা করতে হয়, সেই সন্তান জন্মানোর সাথে-সাথেই তার অপেক্ষার পালা শুরু। কখনও পরীক্ষার ফল বেরানোর অপেক্ষা, কখনও নতুন প্রেমের উত্তর পাওয়ার, কখনও ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়ার এমনকি মৃত্যুর পর চুল্লিতে ওঠার জন্যও অপেক্ষা।

একের পর এক নিষ্প্রাণ শরীরগুলোকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে চলেছে দেবাদিত্য, তার চোখ খুঁজছে আদরের মাসিকাকিমাকে।

একটা নিথর শরীরের উপর নজর পড়তেই আঁতকে উঠল দেবাদিত্য। লাল পাড়, সাদা শাড়ি, সিঁথি ভর্তি রক্তিম সিঁদুর, পায়ের শোভা বারিয়ে জ্বলজ্বল করছে পলাশ রাঙা আলতা। পোশাকের বিচারে এ এক অপরিচিত নারী কিন্তু মুখের গড়নে – সেই অনাবিল হাসির রেখা যেন এখনও লেগে রয়েছে ঠোঁটে, এক্ষুনি যেন মুখ ফুটে বলে উঠবে, কি রে আজ নারকেলের নাড়ু খেতে এলি নাকি দেবা। কিন্তু কই এ শরীর যে আর নড়ল না, কোনোদিনই আর নড়বে না যে। চিরতরের জন্য সেই সুস্বাদু নাড়ুর রহস্য সাথে নিয়ে অনেক দূরে চলে গেল মাসিকাকিমা।

দেবাদিত্যকে দেখে নবারুণ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। প্রকৃত পুরুষ নবারুণ, চোখের জলকে বাগ মানাতে জানে, সে জানে লোকসমক্ষে পুরুষের অশ্রুপাতের অধিকার নেই। এতক্ষণ সেই অলিখিত নিয়ম সে পালনও করে এসেছে কিন্তু শেষরক্ষা আর হল না, শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করল দেবাদিত্যের কাঁধে মাথা দিয়ে।

দেবাদিত্য বেশ অনুভব করতে পারছে, মৃত্যুর এই উষ্ণ প্রান্তরে বন্ধুর চোখের জল বাষ্প হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। সজল ঘন, কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আসছে, একাদশীর চাঁদকে আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা হরণ করে ফেলবে। আচ্ছা, নবারুণের চোখের জল বাষ্প হয়ে কি পৌঁছে যেতে পারবে ওই বারিদের ঘন দঙ্গলে, কে জানে ?নিজের মনে মনে এমন কত অবান্তর ভাবনাকে এই মুহূর্তে প্রশ্রয় দিচ্ছে দেবাদিত্য, হয়তো নিজের মনকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছে, এই সব ছেলে ভোলানো প্রশ্নের জালে।

এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে নবারুণ, দেবাদিত্যকে ছেড়ে সামনে রাখা একটা বেঞ্চের উপর গিয়ে বসল, চোখের ইশারায় দেবাদিত্যকেও ওখানে এসে বসতে বলল। কিন্তু এই মৃত্যু মিছিলে বসার মতো মানসিক শক্তি দেবাদিত্যের নেই, ওর গলা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে পড়েছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

বহু পুরানো স্মৃতি ওর চোখের সামনে ফুটে উঠছে, এই শ্মশান, এরকমই এক অপয়া রাত, সামনে মেহগনি খাটে শুয়ে আদরের বড় জ্যাঠা। তখন দেবাদিত্যের বয়স নয়, জ্যাঠার কোনও সন্তান ছিল না, তাই জ্যাঠার মুখাগ্নির কঠিন দায়িত্ব এসে পড়েছিল দেবাদিত্যের নরম কাঁধে। মুখাগ্নির প্রকৃত অর্থ তখন তার জানা ছিল না, জানা ছিল সরল সন্ধির কিছু নিয়ম, তাই দিয়ে সন্ধি-বিচ্ছেদ করে বুঝেছিল জ্যাঠার মুখে আগুন দিতে হবে তাকে। বাড়ি থেকে শ্মশান অবধি গোটা রাস্তা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়েছিল সে, কি করে দেবে সে আগুন, তাও নিজের প্রিয় জ্যাঠার হাসি মুখে। বেছে বেছে তাকেই কেন এমন নিষ্ঠুরতম কাজের ভার দেওয়া হল, হাজার ভেবেও তার উত্তর পায়নি ছোট ছেলেটা। পরে অবশ্য ভুল ভেঙেছিল তার, মুখে আগুন দিতে হয়নি তাকে, আগুন দেওয়ার জন্য যে ঘর আছে, জ্বলন্ত লাভার মতো জ্বলছিল সে আগুন, তার লেলিহান শিখার দিকে

চোখ যেতেই ঝলসে উঠেছিল বুক টা। সেদিনই ঠিক করেছিল দেবাদিত্য আর কখনও ওই চুল্লিঘরে ঢুকবেনা, আজ অবধি সে ইচ্ছার অনাচার সে করেনি, আর কখনও আসেনি শ্মশানে কিন্তু আজ তাকে সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হল কারণ আজ আবার তার বড় আদরের কেউ চলেছে শেষ যাত্রায়, মেহগনি খাটে চড়ে সেই চুল্লিঘরে।

।।৪।।

ইচ্ছে থাকলেও শেষরক্ষা করে উঠতে পারল না দেবাদিত্য। ওদের পালা আসার ঠিক আগের মুহূর্তে নিজেকে টেনে বের করে আনল ঐ মরণ কুঠির থেকে। বুকভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করল, পারছেনা। কেউ যেন তার মুখের উপর বালিশ চাপা দিয়ে রেখেছে।

মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, কেন নিজের কাছে দেওয়া কথা ভেঙে ছুটে এলাম, কি লাভ হল এতে, শুধু যন্ত্রণাই আরও বাড়ল। কিন্তু না এলে যে মাসিকাকিমাকে শেষ বারের মতো চোখের দেখাটুকুও হত না, কিন্তু এভাবে তাকে দেখে বুকের জ্বালা কি জুড়ল নাকি বাড়ল আরও খানিকটা। আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের এক ঝলক দেখল দেবাদিত্য, অনেকেই কেবল এসেছে সহানুভূতি দেখাতে বা বলা ভালো হাজিরা খাতায় নাম লেখাতে।

- বাবু, ও বাবু আজ একটু সাহায্য করবেন?

গলার স্বর শুনে পিছন ঘুরে দেখল দেবাদিত্য, সেই ভিখারি বালকটা। গত মঙ্গলবার সকালে আমার বাড়ি গিয়েছিল অর্থ সাহায্য চাইতে, কিন্তু সে এখানে কি করছে ? আমাকে অনুসরণ করছে নাকি? কিন্তু কেন?

মুখ-ফুটে আমি কিছু বলার আগেই, ছেলেটা বলে উঠল – চিনতে পারলেন না বাবু, সেদিন আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম, ভিক্ষে চাইতে।

- তুই আমাকে অনুসরণ করছিস কেন ? এখন আবার কি চাই তোর?
- না না বাবু, আমি আপনাকে অনুসরণ করছি না।
- তাহলে এখানে এত রাতে তুই কি করছিস? তোর বোনের না শরীর খারাপ? সে কথা বলেই তো ভিক্ষে চাইতে গেছিলিস, আর আজ সেই বোনকে ছেড়ে......
- ছাড়িনি বাবু, সাথেই রেখেছি। ঐ দেখুন, ঐ যে ওখানে শুয়ে আছে। ছেলেটা আঙুলের ইশারায় রাস্তার ধারে শুয়ে থাকা এক বাচ্চা মেয়েকে দেখাল।
- ওমা ওকে ওভাবে রাস্তার উপর শুইয়ে রেখেছিস কেন ? ওর না শরীর খারাপ। নাকি ওর শরীর খারাপের ফায়দা তুলতেই এসেছিস। আচ্ছা বুঝেছি, মুখের কথায় কাজ হচ্ছেনা বলে ওকে সাথে করে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিস। ছি ছি, লজ্জা করেনা তোর?

ছেলেটা আচমকাই ফুঁপরে কেঁদে উঠল, দু-হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরল। তারপর ধীরে ধীরে বলল – লজ্জা করছে বাবু, ভীষণ লজ্জা করছে। বড় দাদা হয়ে ছোটো বোনের চিকিৎসা না করাতে পারা লজ্জার, তাই লজ্জা করছে। চোখের সামনে যন্ত্রণায় তিল তিল করে বোনকে মরতে দেখেও কিচ্ছু করতে না পারা লজ্জার, তাই লজ্জা করছে। মরার পরও অভাগী বোনটার মুখে আগুনটুকু দিতে পারছি না অর্থাভাবে, এটা লজ্জার – তাই লজ্জা করছে।

সর্বনাশ, কি বলছে ছেলেটা, ওর বোন মৃত? দেবাদিত্যের হৃৎস্পন্দন কমে আসছে, আবার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে,না এ হতে পারেনা।

- হ্যাঁ বাবু, আমার বোনটা মরে গেল।

কথাটা খুব সহজ ভাবে বলল ছেলেটা, কিন্তু সেই কথার আড়ালে লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণার কঠিন, জটিল পাঁচিলগুলো তৎক্ষণাৎ দেবাদিত্যকে যেন পিষে মারতে ছুটে এল। কেউ যেন দেবাদিত্যকে বারবার বলতে লাগল এই নিষ্পাপ প্রাণের মৃত্যুর জন্য তুমিও তো দায়ী। বিশ্বাস করেনি দেবাদিত্য, বিশ্বাস করেনি ছেলেটার কাতর আর্তি, উল্টে সেদিন বলেছিল এই ছেলে আর কদিন পর আবার আসবে বোনের শ্রাদ্ধের

টাকা চাইতে। হে ঈশ্বর, এ কি পাপ করে বসলাম আমি, দেবাদিত্য মনে মনে বলল। আমি তো অবিশ্বাসে মত্ত হয়ে বলেছিলাম তুমি তাতে বিশ্বাস প্রদানের জন্য এত রূঢ় পদক্ষেপ নিলে, কলির মত নিষ্পাপ শিশুকে নিষ্প্রাণ করে দিলে।

- বাবু, ওরা বোনকে পোড়াতে দিচ্ছে না, পাঁচশ টাকা চাইছে। পাঁচদিন আগে বাপ কে পোড়াতে এসে পাঁচশ টাকা দিয়েছিলাম আমার কাছে অত টাকা আর নেই বাবু, থাকলে বোনটাকে মরতে হত না। কিছু সাহায্য করবেন বাবু, কেউ করতে চায় না জানি তবু দয়া করে কিছু সাহায্য আজ করবেন। জানি কেউ একবারে গরীবকে বিশ্বাস করতে চায় না।

শেষ কথাটা কি ও আমায় উদ্দেশ্য করে বলল, যদি বলেও থাকে কিছু তো ভুল বলেনি, হ্যাঁ বিশ্বাস করিনি আমি ওকে আর সেটা হয়তো ও গরীব বলেই, দেবাদিত্য নিজের মনকে বলল।

শহরে ভদ্রলোকেরা যখন বন্যাত্রানে বা আয়লা আক্রান্তদের জন্য সাহায্য চাইতে আসে, তখন তো অর্থ পোশাক সব দিয়ে তাদের সাহায্য করি, এটা জেনেও যে তারা পরোক্ষ ভাবে ঐ সব ভুক্তভোগীদের সঙ্গে জড়িত আর যে গরীব ছেলেটা প্রত্যক্ষ ভাবে আমার কাছে সাহায্য চাইল, তাকে আমি, ছি দেবাদিত্য ছি ছি ছি। হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গিয়েছি, আমার সাথে সাথেই ছেলেটাও এসেছে। মেয়েটার বয়স পুকাই এর মতোই বা ওর চেয়েও কম। গরীব হয়ে জন্মানো যে অপরাধ তা আগে শুনেছিলাম কিন্তু গরীব হয়ে মরাও যে অপরাধ তা আজ দেখলাম।

ছেলেটার দিকে ফিরে তাকালাম, ওর অশ্রুসজল চোখ তখনও আমার কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষায়। আমিই যেন ওর বাঁচার না না জ্বলার একমাত্র অক্সিজেন।

পকেট হাতড়ে মানিব্যাগ বের করে তার মধ্যে থেকে একটা পাঁচশ টাকার নোট টেনে বের করে আনলাম। যে মেয়েটাকে বাঁচানোর জন্য আমি এক টা টাকাও দিইনি আজ তারই লাশ জ্বালানোর জন্য পাঁচশ টাকা দিচ্ছি, ভাগ্যের কি অদ্ভুত পরিহাস!

দেবাদিত্যের হাত থেকে পাঁচশ টাকা নিয়ে পকেটে রাখল ছেলেটা, তারপর মৃত বোনের নিথর শরীরটা কোলে তুলে নিল আর এক ছুটে পৌঁছে গেল শবের মিছিলে লাইন লাগাতে।

রাস্তার এপার থেকে সে দৃশ্য দেখল দেবাদিত্য। এখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্য তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই, সে যে এখন একটা জলজ্যান্ত লাশ, তবে এ লাশের এখনো জ্বলার সময় হয়নি, তাকে এখন ফিরতে হবে হিমঘরের শীতল চেম্বারে। মনের কোণে কোথাও যেন কেউ এক বেদনাতুর রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজিয়ে দিয়েছে, তাতে বেজে চলেছে, “যেতে যেতে একলা পথে নিভেছে মোর বাতি।”

ক বি তা

সভ্যতার মূলে

অভিষেক ঘোষাল

মেহনতি লোক মেহনত করে কাজ করে অহরহ,
তবুও তাদের বুকেতে বিষম জ্বালা জ্বলে দুঃসহ।
একমুঠো ভাত গোটা দুই রুটি দিনের শেষে মেলে,
আধপেটা খেয়ে দিন কেটে যায় এমনি অবহেলে।
ইমারত শুধু ইমারত ওঠে আকাশচুম্বী হায়,
রোদে ঘামে ভিজে কাজ করেও ন্যায্য পাওনা নাহি পায়।
সুখের প্রাসাদ গড়ল যারা বুকের রক্ত দিয়ে,
শোষকের দল শোষণ করে মনুষ্যত্ব বিকিয়ে।
সকলেই কয় নিজের বাড়ি, নিজের হাতেই গড়া,
এমনি করে সত্যিটা যায় মিথ্যে দিয়ে ভরা।
যাদের শক্তি সভ্য সমাজকে করেছে অগ্রসর,
তারাই শোষিত বিপন্ন সেই সভ্যতার কারিগর।।

গল্প

মহালয়ার ক্যাটিক্লিসেম

আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহালয়ার সকাল........

চিৎপুর রোড এর এক সরু গলির ফুটপাথে এক ভিখিরির বাস ..... আজ অনেকদিন হলো সে এখানে থাকে.....

এখন ভোর সাড়ে ৪টে..... ভিখিরিটি উঠে দুবার হাই তুলল...তারপর চোখ কচলাল...

এবার একটা জরুরি কাজ...

তার বসবার আসনের একধারে তার একটা জামার তলায় রাখা একটা ছোট্ট কালো রঙের ব্যাগ....

"দুগ্গা" নাম জপে সে সেটার চেনটা খুলে তার মধ্যে দেখতেই টাকাগুলো আবার নজরে আসল তার..

উফ! প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা আছে! আজ ১০ বছরের পরিশ্রমের ফল এই এত্ত টাকা ! তবে খুব সাবধানে থাকতে হয় ওকে.... পাছে লোকে জেনে ফেলে... ভেবে বসে যে ব্যাটা একটা আস্ত ব্যাঙ্ক ডাকাত!...তাই খুউউব সন্তর্পণে প্রতি সকালবেলা সে টাকা গুলো একবার দেখে রাখে..অন্য কোনসময় ব্যাগটা খোলেও না...এমনকি টাকাগুলো ইউসও করেনা...

এবার ভিখিরিটা আবার চেনটা বন্ধ করে একটু পায়চারী করতে শুরু করলো ফুটপাথটা ধরে..কাগজওয়ালারা সাইকেল চালিয়ে চলে যাচ্ছে....আশেপাশের বাড়ি থেকে বেজে আসছে মহিষাসুরমর্দিনীর মিঠে সুর......

হঠাৎ একজন মহিলা, ভিখিরির ঠিক সামনে এসে হাসি মুখে দাঁড়ালো.... তার মুখে অল্প হাসি..পরনে টপ আর জিন্সের প্যান্ট... সে বললে, "আপনার কাছেই তো ১৫ লক্ষ টাকা আছে.... তাই না?"

ভিখিরি কেমন জানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল...এ আবার কে! আর এ ওর পরিশ্রমের সেই টাকার কথা জানলো কিভাবে? না ...জানতেই পারে...তবে...

---"ম-মানে???" সে বলল....

মেয়েটি বলল..."নানা চিন্তা করবেন না...আমি কোনও কু-মতলব এ আপনার সাথে কথা বলতে আসিনি...আমি আপনার টাকার সুরক্ষার জন্য পথ দেখাতে এসেছি..আপনার টাকার সুরক্ষার জন্য দরকার অস্ত্র ..... আর আমি দেব সেই অস্ত্রের যোগান..ওকে? চলুন তবে!"

ভিখিরি কিসসু বুঝলনা.... তবে তার চোখটা কেমন ধাঁধিয়ে গেল...সব উল্টোপাল্টা হয়ে যেতে থাকলো..আর ক্রমে অতি অদ্ভুত ভাবে তার চোখের সামনের সব দৃশ্য ওলট পালট হয়ে গেলো.... আর সে এসে পড়ল একটা গুমটি মতন নিচু বাড়ির সামনে.......!!

ভিখিরির তখন কি বোকার মতন অবস্থা..... সে পাশ ফিরে তাকাতেই দেখল..মেয়েটি দাঁড়িয়ে .... দাঁড়িয়ে থেকে তার কপালে আঙ্গুল ঘষছে...

মেয়েটি বলল ,"চলুন তবে..ভেতরে ঢোকা যাক! চিন্তা করবেন না.... আপনি সুরক্ষিত আছেন...আর থাকবেনও!"

মেয়েটি ওর হাতটা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরটার মধ্যে ঢোকালো..... ভেতরে কি অন্ধকার.... চারিদিকে অস্তর ঝুলছে...... বন্দুক, গুলি, বোমা.... আরো কত কি!!!

হঠাৎ একটা বিছানার দিকে চোখ পড়ল ওর..সেই বিছানায় পদ্মাসনে বসে রয়েছেন এক দশাসয়ী চেহারার লোক...তার মাথায় ভর্তি চুল, মুখে একগাদা দাড়ি-গোঁফ..... সারা গায়ে সাদা রঙের কিছু একটা মাখানো ... আর হাতে আস্ত একটা মেশিন গান!

লোকটি কেমন করে জানি তার মনের কথা বুঝতে পেরেই বলে উঠলো," আত্মসমর্পণ করে থাকতে হয়.....তাই চুল-দাড়ি কাটবার সময় হয় না.. আর সাদা রং-এর কথা ভাবছেন?? চান-টান বিশেষ করবার সময় পাই না, গায়ের রং বিশ্রী হয়ে উঠেছিল.... তাই পাউডার মেখে থাকতে হয়...!.হে হে ...!"

কিম্ভূত ব্যাপার! তা যাই হোক..এবার ভিখিরির চোখ পড়ল খাট-টার দুদিকে....দুদিকে দুটো গরু বাঁধা রয়েছে...

আবার অদ্ভুত ভাবে এবার মেয়েটি তার মনের কথা বুঝতে পেরে বলে উঠলো...

"হমমম....ওগুলো রান্না হবে....বিফ..মানে গরুর মাংস! আহা...দারুণ খেতে..."!

ইশ....এরা করা??? ভিখিরির মনে সন্দেহ হলো.... গুন্ডা নাকি??? কিন্তু গুন্ডা হলেই বা..আপত্তি কি??.....

হঠাৎ সেই বড় বড় চুল (বা জটাধারী) লোকটি কপালে আঙ্গুল ঘসতে ঘসতে বলল," হুম..অনেক টাকা আপনার....কু-পথে নয়, সৎপথে রোজগার করেছেন..তা ভালো... তবে টাকার সুরক্ষা নেই... আজকাল যা দিন পরেছে...তাতে ভিখিরির কাছ থেকেও টাকা চুরি হয়ে যাওয়া কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয়...এর জন্য চাই আপনার অস্ত্র, প্রচুর গোয়েন্দা ...প্রটেকশন ....প্রটেকশন... হমমম...ওরে নরু!"

হঠাৎ একটা মস্তান গোছের অল্পবয়েসী ছোকরা মুখে বিড়ি হাতে পিস্তল নিয়ে ঘরে ঢুকে এসে বলল,

"নরু আমিই নরু! বলুন ছ্যার.... কি খবর লাগবে?? আমার কাছে সব খবর আছে...সবার খবর রাখি...চুপি চুপি..হে হে!!"

--"ওরে সে আমি জানি রে...এই দ্যাখ...এই লোকটির প্রচুর টাকা..এর প্রটেকশন লাগবে...প্রচুর অস্ত্র,গোয়েন্দা লাগবে.. বুঝলি???? তুই তো

গুপ্তচর.... উমম..নানা,,,, অহহঃ! ওদিকের কি খবর বল দেখি ?"

মস্তান ছেলেটা বলল," উমম...খুব খারাপ ছ্যার ... ওদের সর্দার আমাদের মারবার প্ল্যান করছে.... খুব বাজে ওরা ..ছ্যার...!"

ভিখিরিটির পাশেই সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল চুপি চুপি.... হঠাৎ সে ওর দিকে ফিরে একটা ছবি এগিয়ে দিয়ে বলল "এই যে এরা...."

ছবিতে একদল অসুর মার্কা গুন্ডার ছবি ..... ছবিটা সে আবার মেয়েটিকে ফেরত দিয়ে দিল...

এবার সেই মস্তান ছোকরাটি এগিয়ে এসে বলল..." আসুন দেখি আমার সাথে..." বলে এগিয়ে গেল ডানদিকের একটা দরজা খুলে....

ভিখিরিও এগিয়ে চলল....একটা ঘর ছিল সামনে...সেখানে ঢুকতেই আঁতকে উঠলো সে!

সেখানে একটা মোটা মতন বাচ্চার বিশ্রীধরনের অপারেশন চলছে!

---"এ-এ-ট-টা ক-কি হচ্ছে..ভ-ভাই????"

মস্তান ছেলেটি বলল..." আগ্গে আমি গুপ্তচর নরু... এখানে অপারেশন হচ্ছে..এই ছেলেটির মুন্ডু কেটে মগজটা বের করে একটা হাতির মগজ এর অংশ ওর মধ্যে পুরে দেওয়া হচ্ছে.... হে হে!"

ইশ কি জঘন্য ব্যাপার... জঘন্য হোক..সব কি আর ভালো হওয়া সম্ভব?...

কিন্তু ভিখিরি তবুও বলল ,"এমা...কেন????"

নরু কোনো উত্তর দিল না...সে পকেট থেকে একটা গিটার এর মতন দেখতে মোবাইল বের করে তাতে কার সাথে কথা বলতে থাকল........

---"হ্যালো..হ্যাঁ...প্রটেকশন.......হ্যা হ্যা টাকা...১৫ লক্ষ.,..হমমম.... গোয়েন্দা পাঠান প্রচুর...আর অনেক অস্তর সশুর..... হু..আর কয়েকজন গুপ্তচর ও লাগবে...কতক্ষণ পরে ??? ১৫ সেকেন্ড? আচ্ছা..রাখি.....!"

ফোনটা নামিয়ে ছেলেটি ভিখিরিকে বলল..."আসুন ...."

আবার আরেকটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢোকালো...এখানে অস্ত্র বানানো হচ্ছে..সব অস্ত্রের পার্ট একসাথে জোড়া হচ্ছে...এ কাজে সামিল অনেকে.... এর মধ্যে এককোনে একটা বছর ১৫-এর বাচ্চা বসে একটা বোম বাঁধছে....ভিখিরি কে তার মধ্যে বসিয়ে এক গেলাস জল দিয়ে মস্তান নরু মানে গুপ্তচর নরু চলে গেল............

ভিখিরি প্রবল চিন্তামগ্ন..এদিকে সেই বোম বাঁধা ছেলেটি ওকে জিগ্গেস করলে," পয়সা আপনার অনেক ....না??? সাবধান থাকবেন..অবিস্যি এবার আর চিন্তা নেই...অনেক গোয়েন্দা দপ্তর আপনার ভিক্ষার এলাকায় লোক পাঠিয়েছে... তারা টাকাটার দিকে সর্বক্ষণ চোখ রাখছে....অনেক বড় বড় পুলিশের কুকুর ছাড়া রয়েছে জায়গাতে..টাকার ব্যাগ টাকে একটা খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে... তার সামনে ১৫ জন পাহারাদার সামিল .... তাছাড়া জায়গাটার চারিদিকে সিসিটিভি ...আর ওই কি যেন বলে না.... গুপতচর দের মাইক লাগানো রয়েছে...!"

বাপরে! ভিখিরি ভয় পেয়ে গেল! এত্ত কিছু ঘটছে এখন??? (এততাড়াতাড়ি!!!) এখন কি কি ঘটছে ওর ওই শান্ত গলিটার একটা ছোট্ট ভিক্ষার স্থানে? অদ্ভুত! কিন্তু এরাই বা করা??? মহাপুরুষ নাকি ভগবান??? বাহ বাহ..দারুন ······

তবে অদ্ভুত কেন...এগুলো তো হচ্ছেই!

.... কিন্তু সত্যি-ই কি এসব ঘটছে?? ভিখিরিকে মেয়েটা কিভাবে এখানে নিয়ে এলো? (টাকার ব্যাগ টাও ভিখিরি দিব্বি ওখানে রেখে চলে এলো..কিই বা করবার ছিল তখন..??) ওই জটাধারীটা কে? এখানে গুপ্তচরই বা আছে কেন? এরা কি জাত? গরু খায়.আবার..মেয়েটির মাথায় সিঁদুর...তবে কি এরা....আর ছেলেটার মগজ বের করে তার মধ্যে হাতির মগজ ঢোকানো হচ্ছে কেন? আর শেষমেষ এই ছেলেটি কে ?? বোমা কেন এত? আর অস্তর-সস্তর? আশ্চর্য হলেও ...এগুলো তো হচ্ছে... বা হয়ে গেছে..!

ছেলেটি বলল,"আমি কার্তিক পালোধী..... আমি ক্যারিয়ার.... মাওবাদী এলাকায় থাকতাম..এখন এখানে কাজ করি..... কেমন?? ভালো না??"

ভিখিরি কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না..... এতটুকু বাচ্চা ছেলে..........

এবার ওর মনে দুশ্চিন্তা জাগছে..এত প্রটেকশন এর পরেও টাকাটার তো কোনো খোঁজ নেই কেন?? ব্যাগটার খোঁজ আছে..কিন্তু টাকাটার খোঁজ কই??

সে ক্যারিয়ার ছেলেটিকে জিগেস করলো," তুমি ..তুমি.... জান??"

--"কি জানব?"

-" মানে ইয়ে আমার টাকাটা ঠিক আছে তো?"

--"সব ঠিক আছে.."

--"নানা টাকা টা... সব তো ঠিক আছে জানি...কত্ত সুরক্ষা..ঠিক না থেকে যাবে কোথায়?? .কিন্তু আমার টাকা-টা.........."

হঠাৎ সেই জটাধারী, ওই মেয়েটি, আর নরু গুপ্তচর একসাথে ঘরে এসে ঢুকলো....

তারা বলল..." আপনার খাওয়ার আসছে...."

---“ক-কিন্তু মানে আমি ঠিক আসলে ...খাওয়ার...আমাকে যেতে হ-হ.বে...."

মেয়েটি বলল," নানা এখন কি যাবেন.... আসলে আমার মেয়ে ব্যাঙ্কে চাকরি করে....এছাড়া গানবাজনায়ও মন আছে..সে-ই আপনার পুরো টাকার ম্যানেজমেন্ট টা দেখছে..চিন্তা করবেন না !"

--"আমাকে যেতেই হবে বলছি তো!!!" ভিখিরি গলা চড়িয়ে বলে উঠলো.....

জটাধারী খেপে উঠে বলল..."সাবধান!"

ভিখিরি দৌড়ে পালাতে গেল.... সেই ক্যারিয়ার এসে পথ অবরোধ করলো... তখন তার হাতে একটা একে ফরটি সেভেন!..!....

তাকে কোনমতে ঠেলে সরিয়ে পালাতে গিয়ে হঠাৎ আবার সামনে একটি ভুঁড়িওলা বাচ্চা আবার পথ আটকালো... সে হঠাৎ গর্জন দিয়ে উঠলো...."গ্রোআঅউউ" ....ঠিক অবিকল হাতির ডাক!

উফ.উফ....ভিখিরি
পালালো..পালাচ্ছে...পারছেনা...পরে
যাচ্ছে...গরুগুলোও তেড়ে আসছে....আর
তারপর..তারপর..
চোখের সামনে একটা সাইনবোর্ড ...সেখানে লেখা "কোমা।" .... তার দরজা ঠেলতেই টার ভিতরে একজনের অক্সিজেন চলছে... তার শরীর নীল... নীল নীল.....আর আ-
আর...

****

ভিখিরি পরে বাড়ি ফিরেছিল.... চিৎপুর রোডের সেই গলির ধারের তার ভিক্ষার স্থানে..সেখানে কেউ ছিলনা..শুনসান..তার টাকার ব্যাগ টাও সে পায়নি! কোথায় গেল? হয়ত সেই গুন্ডারা নিয়ে গেছিল..যাদের অসুর এর মতন দেখতে.যারা ওই জটাধারীদের শত্রু..... আর পরে ওই মেয়েটি নাকি গুন্ডাদের সর্দার টাকেও মেরেছিল.... কিন্তু তাদের সাগরেতরা পার পেয়ে গেসলো...তারা মরেনি..মরবেওনা ..তারা বেড়ে চলেছে সংখায়...বাড়বেও...

ভিখিরি তার টাকা ফিরে পায়নি...শুধু টাকার জায়গায় একটা দামী খাঁচা পাওয়া গেসলো..আর পাড়া-পড়শীরা আলোচনা করছিল যে দুপুরবেলা নাকি ওখানে অনেক কুকুর, লোক, বন্দুক হাতে এসছিল..তাদের কালো কালো চশমা পরা..

একজনের নাকি আবার চারটে মাথা! তাই নিয়ে নাকি কত হুলুস্থুলু কান্ড.... তারাই কি সেই গোয়েন্দা রা ? গুপ্তচরেরা??? ,.,,,,চারটে মাথা লোকটা কে? অন্য গ্রহের প্রাণী??? আর আবার ওদিকে বারবার কপালে আঙুল ঘসবার কারণ কি???

এত সাবধানতা করতে গিয়ে...ভিখিরি শুধুশুধু তার সাধের টাকা হারিয়ে ফেলল...

আর সেই মেয়েটিকেও দেখেনি সে...না তো সেই ক্যারিয়ার কার্তিক ..কিম্বা হাতিমানুষকে.....

কিভাবে সে ওখান থেকে ফিরেছিল? জানেনা সে....

সবটাই...শেষ ..... !!!!

...পুলিশ অনেক রাতে এসে ভিখিরিকে ধরে নিয়ে গেল...মিডিয়া ক্যামেরা হাতে তৈরী!
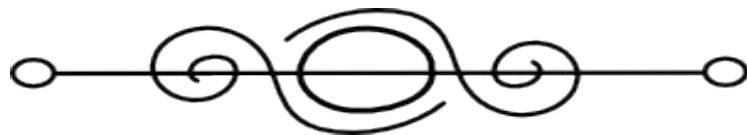
অন্ধ মৃত্যু - অর্ক চক্রবর্তী

কালো মানুষ - অর্ক চক্রবর্তী

কবিতা

তুমি আছ

সাগ্নিক প্রসাদ ঘোষ

নির্জন নির্বাক সৈকতে একলা বসে আছি আমি,
পথ চেয়ে শুধু তোমারই প্রতীক্ষায়।
আর তুমি এসেছ ফিরে বারবার, প্রতিটি ঢেউয়ের সাথে।
হ্যাঁ, প্রেমিকা আছে কাছে, কিন্তু তুমি আছ
আরও কাছে, খুব কাছে, কিন্তু তুমি আছ
আরও আছে, খুব কাছে, ঢেউয়েরা যেভাবে আছে।

শুনেছো কখনও কুহুডাক গ্রীষ্মের দাবদাহে ?
বা দেখেছো কখনও সাদা পাল, বর্ষার ঘনঘটায় ?
কিন্তু আমি শিখেছি এই প্রেমের ভাষা
তারও আগে, বহু আগে, তোমারই কাছ থেকে।

আমার প্রতিটি রাত কাটে শুধুই তোমার সাথে কথা বলে,
তোমার পাশে থেকে।
সেই মায়াবী ঠোঁটের ঘ্রানে আজও আচ্ছন্ন আমি
ভেসে যেতে চাই এক অজানা জোয়ারের টানে,
শুধু তুমি থেকো --- সাথে।

গল্প

বিসর্জন

সৌম্যদীপ পাল

বাইপাসের সকালবেলার জ্যামে কালো রং-এর সেডানটা মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে, পেছনের সীটে বসে অলীক খবরের কাগজটায় চোখ বোলাতে বোলাতেই মোবাইলে প্রয়োজনীয় মেল গুলো একটু নাড়াচাড়া করছে। বহুজাতিক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার উচ্চ পদস্ত চাকুরে। প্রচুর চাপ। তাই এ সমস্ত কাজগুলো তার অফিসে যাতায়াতের পথেই সারতে হয়।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী সন্তান অলীক। বাবা সরকারী চাকুরে ছিলেন। এখন অবসর সময় কাটাচ্ছেন। বাবা , মার একমাত্র ছেলের সুখী , নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। পড়াশনায় অলীক বরাবরই প্রথম দিকে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যাদবপুরে চান্স পাবার পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।একদম ধুমকেতুর মতো উত্থান।

অফিসে মাস ছয়েক হল একটা নতুন মেয়ে জয়েন করেছে। বন্যা। কুলতলীর নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। গ্রামের প্রাইমরী শিক্ষক বাবা অনেক চেয়ে চিনতে, জমি বেচে, মেয়েকে সারাজীবনের সম্পদ দিয়ে পড়িয়েছেন। বন্যা এখন গ্রামের একমাত্র ইঞ্জিনিয়ার। কত প্রতিবন্ধকতা এসেছে। ওর মা-ই কতবার বলেছে..... " মেয়ে পড়িয়ে কী হবে?? সেই তো পরের বাড়ি গিয়ে স্বামী সন্তানের সেবা করবে। ওর বিয়ে দিয়ে দাও।" একরোখা মেয়ে সেটা কেই চ্যালেঞ্জ করে আরো ভালো রেজাল্ট করেছে। অবশেষে কলেজ থেকে এখানে চাকরী। অফিসে বন্যা অলীকের এ জুনিয়র। মৃদুভসি, লাজুক মেয়েটা আপ্রাণ চেষ্টা করে সময়ের কাজ সময়ে করে ফেলতে। অলীকের এসব নজর এড়ায়না।

একটা অদ্ভুত মায়া আছে বন্যার চোখ দুটোয়। অভাবের সংসার থেকে উঠে আসা বলেই হয়ত কাজলের আড়ালে সেটা ফুটে বেরিয়ে আসে। যেন অনেক কষ্টের কথা অস্ফুটে বলে চলে।আজকাল যখন খবরের কাগজে মধ্যামিক, উচ্চ মধ্যামিকে দারিদ্র, মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের কথা বেরোয়, সেগুলো পড়ে চোখ দুটো চিক চিক করে ওঠে ওর। ভাবে যেন ওর নিজেরই ফেলে আসা দিন গুলোর সাফল্য চেপেছে আজ। মনে ইচ্ছা, যেন একটু সচ্ছল হলেই ওদের জন্য কিছু করে ছুটে গিয়ে।

অলীক এমনিতে জুনিয়রদের সাথে কাজের কথা ছাড়া বেশি কথা বলে না। যতই হোক সিনিয়র এমপ্লায়ী বলে কথা। যেন স্টেটাসটা এখানে একটু বেশিই চলে! বন্যা আসার পর কেমন যেন একটু হলেও বদলাতে সুরু করেছে অলীক। ওর সাথে অন্যদের থেকে একটু বেশিই সময় কাটায় বা কাটাতে চায়। অন্য কলীগদেরও তা চোখ এড়ায় না। যদিও সামনে কিছু বলার সাহস কেউ পায় না।

ক'দিন আগেই বন্যার জন্মদিনে অফিসের সবাই যখন চাঁদা তুলে গিফ্‌ট দিল, তখন অলীক আলাদা ভাবে বেশ একখানা সালোয়ার গিফ্‌ট করল। অলীক বুঝতে পারে না সে কী সত্যিই বন্যাকে ভালবাসতে শুরু করেছে! নাকি এটা শুধুমাত্র একটা ভাল লাগা। বাড়িতে এখন প্রায়ই অলীকের বিয়ের কথা হয়। বাবা

মা ও চান এবার একটা সম্পূর্ন পরিবার। মা তো আত্মীয়স্বজনদের বলে রেখেছেন অলীকের জন্য পাত্রী খুঁজতে।

ফোনের খুঁটিনাটি সেরে অলীক পেপারে মন দিলো। বর্ষাকাল তখন। তার উপর নিম্নচাপের জেরে কলকাতাতে গোটা দু'দিন বেশ বৃষ্টি হয়েছে। পেপারের প্রথম পাতায় ঘূর্ণি ঝড় আয়লার খবর। সুন্দরবন ও সংলগ্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দিয়েছে। অনেক গ্রামের বাঁধ ভেঙ্গেছে। বহু মানুষ ঘরছাড়া। এইসবে চোখ বোলাতে বোলাতে অলীকের হাত ফোনে পড়তেই ফেসবুকটা খুলল। কাজের চাপে এমনিতেও রেগুলার ফেসবুক খোলা হয় না। মাঝেমধ্যে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে অনলাইন হয়।

মেসেজ বক্সে অনেক অপ্রইয়োজনীয় মেসেজের মাঝে বন্যার একটা মেসেজ চোখে পড়লো। "অলীকদা, আমাদের গ্রামের বাঁধ ভেঙ্গেছে, আমরা সবাই জল বন্দী···। বাবা মাঠে বেরিয়ে গতকাল থেকে নিরুদ্দেশ। জল ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের বাড়িটাও হয়ত পরে যাবে। ভালো থেকো। তোমার বন্যার হয়ত ওখানেই বিসর্জন। এই কইদিনে তোমাদের থেকে অনেক পেয়েছি। যদি ভাগ্যে থাকে তাহলে আবার দেখা হবে"।

এটা দেখে অলীকের বুক কেঁপে উঠলো। ক্রমাগত ফোনে চেষ্টা করেও না পেয়ে, হতাশ হয়ে ফেসবুকে চোখ বোলাতেই একটা পোস্টে চোখ আটকালো। অফিসেই বন্যার এক বান্ধবী ওরই একটা ছবি দিয়ে পোস্ট করেছে...

"খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলি রে বন্যা। তোকে খুব মিস করব, ভালো থাকিস। তোর আত্মার শান্তি কামনা করি''।

ছবিতে বন্যার পরনে অলীকের দেওয়া জন্মদিনের সালোয়ারটা। চোখের জল বাঁধ মানল না অলীকের। ফেসবুকে ওই হাসিমুখেই বন্যা থাকুক। এই জীবনে অলীকের বন্যার বন্যাতেই বিসর্জন।
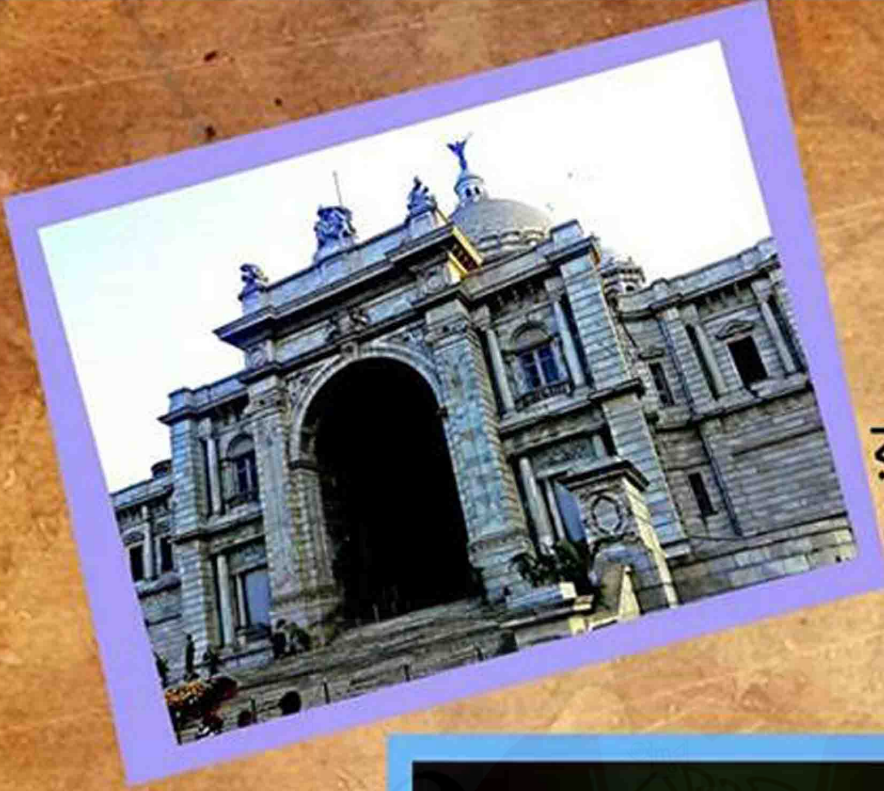
রাজকীয়
সৌমি মল্লিক
রোদ ও ফড়িং
বিভাস মজুমদার
অযত্নে
সৌমি মল্লিক

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব

আবার বেজে উঠল ঢাক । আবার শুনবে মহিষাসুরমর্দিনী । আর একই সঙ্গে এক বছরে পদার্পন । ফেলুদার ভক্তদের নিয়ে এই প্রচেষ্টা আজ কিছুটা   লেও সফল । বাকি রইল অপেক্ষা পরের পদক্ষেপের জন্য । তার মাঝেই বলে রাখি আপনাদের ভালবাসাই আজ আমাদের এক বছরে দুটো স খ্যা (শারদীয়া এবং বৈশাখী) প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেছে । তাই ভাল থাকুন , ভাল র খুন এবং পুজো কাটান জমজমাট ভাবে যেসবুকে এলে অবশ্যই আমাদের গ্রুপে কিছুটা সময় কাটান । আর ই-পুজাবার্ষিকী কেমন লাগল জানাতে ভুলবেন না

Contact us

feludafanclub.01@gmail.com

www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/